কল্যাণময়ী

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

মনোহর সাহিত্য মন্দির

২৭সি, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

কল্যাণময়ী

॥ এক ॥

মস্ত বড় একটা মামলা চলছিল জেল আদালতে।

বিজনবাবুকে বর্ধমান যেতে হলো মামলা তদবির করবার জন্যে।

ভাল দেখে একজন উকিল দিতে হবে। অমরবাবু নামকরা উকিল। তাঁর সঙ্গে বিজনবাবুর অনেকদিনের পরিচয়। তাঁরই বাড়িতে গেলেন তিনি। কাগজপত্র দেখাতে হবে, মামলা বুঝিয়ে দিতে হবে, কাজেই সময় হাতে রেখেই গিয়েছিলেন সেখানে।

অমরবাবুর প্রকাণ্ড বাড়ি। দোরে একজন দারোয়ান বসেছিল। বললেন, বাবুকে খবর দাও। বল—

কথাটা শেষ তাঁর হলো না। দারোয়ান বললে—বাবুর তো খুব বেমারী আছে হুজুর।

—বেমারী ?

—হাঁ বাবু ডাংদারবাবু এসেছেন। ওই তো তাঁর গাড়ী।

বিজনবাবু থমকে দাঁড়ালেন। ভদ্রলোকের অসুখ করেছে। না দেখা করে চলে যাওয়াও তো উচিত নয়। দারোয়ানকে বললেন—বাবুকে একবার খবর দাও। বল বিজনবাবু এসেছেন।

দারোয়ান গেল আর ফিরে এলো।

—আসুন বাবু। উনি ডাকছেন আপনাকে।

বিজনবাবু ঘরে ঢুকেই বললেন—অসুখ নাকি ?

অমরবাবু বললেন—আপনার কথাই ভাবছিলাম আমি।

—আমার কথা ভাবছিলেন কেন ?

—বলছি। বলেই তিনি ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বললেন—আপনি একটু পাশের ঘরে যান ডাক্তারবাবু। আমার কিছু গোপনীয় কথা আছে ওঁর সঙ্গে।

ডাক্তারবাবু উঠে গেলেন। তারই সেই চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বসলেন বিজনবাবু।

কিন্তু অমরবাবুর মুখের দিকে তাকিয়েই দেখেন তিনি কাঁদছেন। তাঁর দু' চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

একটি তরুণী মেয়ে কাছেই দাঁড়িয়েছিল। বোধকরি অমরবাবুরই মেয়ে। বাপের মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে চোখ দুটি সে আঁচল দিয়ে মুছে দিলে। জিজ্ঞাসা করলে—কি হয়েছে বাবা ?

—কিছু না।

মেয়েটি চলে যাচ্ছিল।

অমরবাবু বললেন—যাস না মিতালী, বোস্।

বলেই তিনি বিজনবাবুর দিকে চোখ ফেরালেন। বললেন—হাত দুটো তোলবার উপায় নেই বিজনবাবু পঙ্গু হয়ে গেছে। অনেক পাপ করেছি জীবনে, ভগবান তারই শাস্তি দিয়েছেন।

কথাটা শেষ করেই তিনি চোখ বুজে কি যেন ভাবতে লাগলেন। তারপর চোখ চেয়ে বললেন—আমার উইলের সেই কপিটা নিয়ে আয় তো মা।

মিতালী উইল আনতে গেল। অমরবাবু বললেন—আমার ওই মেয়েটিকেই আমার যা কিছু সব দিয়ে গেলাম বিজনবাবু। আর ও ছাড়া আমার আছেই বা কে !

বিজনবাবু জানতেন অমরবাবু বিপত্নীক। এর বেশী তিনি আর কিছু জানতেন না। জিজ্ঞাসা করলেন—মেয়ের বিয়ে ত এখনও হয়নি দেখছি।

অমরবাবুর মুখের চেহারা হঠাৎ অন্য রকম হয়ে গেল। একটা

ঢোঁক্ গিলে ধীরে ধীরে বললেন—আপনার কাছে গোপন করে লাভ নেই। হয়েছিল। বিয়ে ওর আমি দিয়েছিলাম কিন্তু তিন বছর পরেই বিধবা হলো। ওর বিয়ে আমি আবার দিতে চাই। বুঝলেন ?

এমন সময় মিতালী একটি কাগজ হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকল। অমরবাবু বললেন—দাও ওঁর হাতে। তুই এখন যা মা এখান থেকে। আবার ডাকলেই যেন আসিস্। আর হাঁ ছাখ্ এমনি স্বার্থপর মন—কথায় কথায় আসল কথাটাই ভুলে যাই। বিজনবাবুর খাবার কথা ঠাকুরকে বলে দে।

বিজনবাবু তখন উইলখানি খুলে পড়তে আরম্ভ করেছেন। চার লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ—তিরিশ হাজার টাকা নগদ—কলকাতা শহরে দু'খানি বড় বড় বাড়ি মাসিক ভাড়া চারশ টাকা। যে বাড়িতে বর্তমানে তিনি বাস করছেন এই বাড়িখানি এবং গিরিডিতে একখানি বাড়ি ও সাত বিঘা জমি। এই অমরবাবুর নিজস্ব সম্পত্তি। এ সমস্তই তিনি তাঁর একমাত্র কন্যা শ্রীমতী মিতালীরাণী দেবীকে দিয়ে যাচ্ছেন।

অমরবাবু বললেন—বিয়ে আমি ওর দিতে পারতাম বিজনবাবু। আমার একমাত্র মেয়ে টাকার লোভে অনেকেই রাজী হতো, কিন্তু ভাবতাম কি জানেন ? গরীবের ছেলের সঙ্গে যদি দিই সে চাইবে টাকাটা কেমন করে সে নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে পেতে পারে, পেলেও হয়ত সে রাখতে পারবে না নষ্ট করে দেবে। আর বড় লোকের ছেলের সঙ্গে যদি বিয়ে দিই ত মেয়ের আমার এতটুকু দোষ দেখলে সে ভাববে হয়ত ওই টাকার গুমরে স্ত্রী তাকে অগ্রাহ্য করছে, তাহলে সুখী হতে পারবে না।

এমনি সব নানান্ কথা ভাবতেই আমার সময় গেছে। মিতালীর বিয়ে দেওয়া আর হয়ে ওঠেনি বিজনবাবু। এখন আমি করি কি সেই

পরামর্শই আপনি আমায় দিন। সময় আমার ফুরিয়ে এসেছে।

বিজনবাবু ভারি বিপদে পড়লেন। মিতালীরাণী সুন্দরী মোটেই নয়। যে-ই বিয়ে করুক, সে যে টাকার লোভেই করবে সে কথা নিঃসন্দেহ।

এত টাকা! বিজনবাবুর নিজেরই লোভ হচ্ছিল। কিন্তু কথাটা তিনি বলেন কেমন করে।

উইলের ওপর চোখ রেখে বিজনবাবু আবার জিজ্ঞাসা করলেন—কি ভাবছেন বলুন ত?

—ভাবছি—বলে মুখ তুলে বিজনবাবু বললেন—আচ্ছা পাত্রের বয়স যদি একটু বেশী হয়—

অমরবাবু বললেন—আছে আপনার হাতে? হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। ছেলেমানুষ ত আমি চাই না। তা ছাড়া আমার মেয়ের বয়সও তো প্রায় তিরিশ হতে চললো।

—ত্রিশ! মিতালীর চেহারা দেখে এতটা তিনি ভাবতে পারেননি। বললেন—না, জানা-শোনার মধ্যে তেমন আর কে-ই বা আছে। তবে যদি ওর পাত্র নাও জোটে তাহলেও আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ভাববেন না। টাকাকড়ি ওর আমি একটিও নষ্ট হতে দেবো না। প্রয়োজন হলে—মিতালীকে আমি নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে রাখব।

—সেই জন্যেই আপনাকে আমি খুঁজছিলাম বিজনবাবু। যতবার ভেবেছি ততবার শুধু আপনার কথাই মনে হয়েছে।

বিজনবাবু বললেন—তবে কিনা আমারও সেই আপনারই মত অবস্থা। স্ত্রী মারা গেল। আমারও সেই একটি মাত্র মেয়ে। তবে মেয়েটির বিয়ে দিয়েছি এই যা!

অমরবাবু বললেন—স্ত্রী মারা গেছেন?

বিজনবাবু মাথা নেড়ে বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ!

—কিন্তু বয়েস ত আপনার বেশী নয়!

—তা নয়ই বা কেন, চল্লিশ পেরিয়েছে।

অমরবাবু বললেন—আমার চেয়ে অনেক ছোট। আচ্ছা তাহলে ধরুন আপনাকে যদি আমি একটি অনুরোধ করি রাখবেন ?

অমরবাবু বললেন—আপনারই হাতে আমার মিতালীকে দিলাম বিজনবাবু। আপনি ওকে বিয়ে করে—আমায় বাঁচান। ওর বিয়ে না দিয়ে আমি মরতে পারছি না।

বিজনবাবু মাথা হেঁট করে রইলেন।

বললেন—এই বয়সে বিয়েটা—লোকে কিছু না বলে আমার শুধু সেই ভয়। মিতালীর ভার আমি নিতে রাজী আছি, আপনি ভাবছেন কেন ?

অমরবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন—লোকে আবার বলবে কি ? কিছু বলবে না। ভগবান সেই জন্যই আজ আপনাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন আমি বুঝতে পারছি। মিতালী—মিতালী।

হেলতে দুলতে মিতালীরাণী দরজার পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকল।

অমরবাবু বললেন—আয় মা! যাক্ আজ আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

—এদিকে নয় ওদিকে, ওইখানে—ওই বিজনবাবুর কাছে। বিজনবাবু যেখানে মাথা হেঁট করে বসেছিলেন, মিতালী এসে দাঁড়াল।

—দু হাত যে এক করে দেবো সে ক্ষমতাও আমার নেই। নিন্ আপনি ধরুন ওর হাতখানা। বলুন—একে আমি গ্রহণ করলাম। আমি আশীর্ব্বাদ করি। তারপর পুরুত ডেকে বিয়ের ব্যবস্থাও আমি আজই করছি।

মিতালীর একখানি হাত বিজনবাবু তাঁর নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিলেন।

॥ দুই ॥

মিতালীরাণীকে বিয়ে করে বিজনবাবু তাঁর শ্বশুরের মৃত্যুর পথ পরিষ্কার করে দিলেন। কিন্তু বর্ধমান থেকে ফেরবার সময় সদ্য-বিবাহিতা স্ত্রীকে তিনি সঙ্গে আনতে পারলেন না।

না পারবার প্রথম কারণ—অমরবাবু এখনও বেঁচে আছেন ; দ্বিতীয় কারণ—তিনি যে আবার বিয়ে করলেন—সেকথা সম্প্রতি কাউকে জানাতে চান না।

বিজনবাবু ফিরে এলেন রতনপুরে—তাঁর চাকরীর জায়গায়। রতনপুরের জমিদার বাড়ীর কাছেই ম্যানেজারের কোয়ার্টার। চমৎকার একখানি দোতলা বাড়ি।

বাড়িতে একজন চাকর আর একজন রাঁধুনী বামুন ছাড়া আর কেউ নেই।

পরদিন সকালে বিজনবাবু দোতলার বসবার ঘরে বসে একখানি চিঠি লিখছিলেন। লিখছিলেন বোধকরি তাঁর স্ত্রী মিতালীরাণীকেই।

এমন সময় একজন লোক ঘরে ঢুকে দরজার কাছে তার লাঠি গাছটি নামিয়ে গড় হয়ে একটি প্রণাম করলে।

বিজনবাবু মুখ তুলে দেখলেন। বললেন কে রে, রামু ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু এলাম দেশ থেকে। মা পাঠালেন। এই বলে রামু তার গলায় জড়ানো গামছার খুঁট থেকে একটি চিঠি খুলে হাত বাড়িয়ে বাবুর পায়ের কাছে নামিয়ে দিলে।

বিজনবাবু চিঠিখানি তুলে নিয়ে ভাঁজ খুলে পড়লেন। চিঠিখানি এই :

শ্রীচরণকমলেষু—

অনেকদিন তোমার কোন সংবাদ পাই না। এমন করিয়া চুপ করিয়া তুমি আছ কেমন করিয়া জানি না।

ধন্য মানুষ যা হোক। এই লইয়া তিনবার লোক পাঠাইলাম। শুনেতেছি তুমি নাকি মোকর্দমা করিতে বর্ধমান গিয়াছ। যাই হোক আজ আবার রামুকে পাঠাইতেছি।

একজন ভাল ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে তুমি এই চিঠি পাইবামাত্র আসিও। না আসিলে মেয়েটা বোধ হয় আর বাঁচিবে না। লতা যদি না বাঁচে ত আমিও মরিব।

ছেলে হইবার পরদিন হইতে লতা আর উঠিতে পারেনি। রোজ জ্বর হয়। পরশু থেকে এমন হইয়াছে যে সবাই বলিতেছে সে আর বাঁচিবে না।

এখানে একজন ভাল ডাক্তার কবিরাজ নাই যে ডাকিয়া দেখাইব। কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমার দিন কাটিতেছে। তোমাকে আর কি লিখিব নিজের মেয়ে মরিতে বসিয়াছে—যাহা হয় করিও। নিবেদন ইতি—

সেবিকা—কামিনী।

বিজনবাবু তাহলে মিথ্যা বলেছেন। তাঁর স্ত্রী এখনও মরেন নি।

চিঠিখানি পড়ে মুখের চেহারা তাঁর অন্য রকম হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ঘরের মধ্যে অস্থির ভাবে পায়চারী করতে করতে হঠাৎ এক সময় থমকে দাঁড়িয়ে বললেন—রামু!

রামু বললে—আজ্ঞে!

—তুই যা। গিয়ে বললে—ডাক্তার নিয়ে উনি আসছেন।

—চিঠিপত্র কিছু।

ঘাড় নেড়ে বিজনবাবু বললেন—না। চিঠির দরকার নেই। তুই এখুনি যা। গিয়ে বলগে বুঝলি ?

রামু তার গলায় গামছাটি আর একবার ভাল করে জড়িয়ে লাঠি

গাছটি তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালে এবং হাত দুটি জোড় করে হেঁট হয়ে একটি প্রণাম করে বললে—তাহলে আমি আসি হুজুর।

পেছন ফিরে রামু চলে যাচ্ছিল, বিজনবাবু আবার তাকে ডাকলেন —শোন্।

রামু ফিরে দাঁড়াতেই তিনি তাঁর পকেট থেকে একটি সিকি বের করে তার পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন—রাস্তায় কোথাও জলটল খাস্।

সিকিটি হাসতে হাসতে কুড়িয়ে নিয়ে চলে গেল।

বিজনবাবু আবার অন্যমনস্ক ভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারী আরম্ভ করলেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোনও কাজেই আর মন দিতে পারলেন না।

রতনপুর থেকে সুখচর ক্রোশ চারেকের পথ। পথ ভাল। বাস সার্ভিসের দুখানা বাস আজকাল এই পথের ওপর দিয়ে হরদম যাতায়াত করে।

কিন্তু বিজনবাবু জমিদারী এষ্টেটের ম্যানেজার। বাসে চড়ে যাওয়া তাঁর চলে না। মোটর গাড়ী অবশ্য এখনও তিনি কেনেন নি বাবুদের গাড়ীতেই তাঁর কাজ চলে।

একজন ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে সেইদিনই সন্ধ্যায় তিনি সুখচরে যাচ্ছিলেন। গ্রামের কাছাকাছি তাঁর গাড়ী গিয়ে পোঁছেচে এমন সময় মনে হলো দূরে কারা যেন শবদেহ কাঁধে নিয়ে রাস্তা পার হচ্ছে। সুখচর গ্রামে মানুষ মরলে এই পাথ দিয়েই পাকা রাস্তাটা পার হয়ে শ্মশানে যেতে হয়।

বিজনবাবু তাড়াতাড়ি মোটর চালাতে বললেন।

মোটরখানা শববাহকদের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালো। যারা শব

নিয়ে যাচ্ছিল, সকলেই বিজনবাবুর প্রতিবেশী। মোটরের কাছে জনকতক লোক এগিয়ে এলো।

কে একজন বললে—এতক্ষণে এলেন ? ঘণ্টা দুই আগে এলেও দেখতে পেতেন।

বিজনবাবু তখন একদৃষ্টে শবদেহের দিকে তাকিয়ে আছেন। দড়ির একটা খাটিয়ার ওপর লতার মৃতদেহ জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বিজন বাবু দেখলেন তার সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি।

দেখলেন এখনও তা ম্লান হয়নি। মনে হচ্ছে যেন সে চোখ বুজে ঘুমোচ্ছে। মাথায় একপিঠ কালো চুল খাটের ওপর ছড়ানো। সৌভাগ্যবতী সধবা মেয়ে মরেছে স্বামী পুত্র রেখে। তাই তার মৃতদেহটিকে প্রতিবেশী মেয়েরা লাল আলতায় আর সিঁদুরে ভরিয়ে দিয়েছে।

বিজনবাবু আর বাড়ি গেলেন না। সেইখান থেকেই মোটর ফিরিয়ে সোফারকে বললেন—রতনপুরে চল।

সশব্দে মোটর চলছিল। ডাক্তারবাবু এতক্ষণ একটি কথাও বলেননি। এবারে নিজের হাতখানি ধীরে ধীরে বিজনবাবুর কাঁধে রেখে বললেন—বাড়িতে আপনার স্ত্রী আছেন না ?

প্রশ্ন শুনে বিজনবাবু যেন চমকে উঠলেন। মাথাটা একটু কাৎ করে বললেন—হুঁ।

ডাক্তারবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবলেন তারপর আবার বললেন—বাড়ি যাওয়া আপনার উচিত ছিল।

বিজনবাবু এবারেও শুধু একবার ঘাড় নেড়ে বললেন—হুঁ।

ডাক্তারবাবু থাকেন শহরে। রতনপুর থেকে মাইল পাঁচেক দক্ষিণে। শহরে যেতে হলে এখান থেকেই বাঁ দিকে পথ ভাঙতে হয়।

মোড়ের মাথায় এলে বিজনবাবু সোফারকে বললেন—এগিয়ে চল। ডাক্তারবাবুকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

গাড়ি রতনপুরে না গিয়ে শহরের রাস্তা ধরল।

ডাক্তারবাবু আমার কথা বললেন। বললেন—শহরে আমাকে নামিয়ে দিয়েই আপনি একবার যান বিজনবাবু। বলেন ত চলুন আমি আপনাকে রেখে আসি।

বিজনবাবু মাথা হেঁট করে বাড়ি যাবার কথাটাই ভাবছিলেন কিনা জানি না। বললেন—হ্যাঁ যাব।

ডাক্তারবাবু বললেন—তাহলে চলুন না আমিই আপনাকে রেখে আসি। একা যেতে আপনার কষ্ট হবে।

বিজনবাবু মাথা নেড়ে বললেন—না। আপনাকে আগে রেখে আসি।

দেখতে দেখতে গাড়ি শহরে এসে পেঁ ছাল।

ডাক্তারখানার দরজায় গাড়ি দাঁড়াতেই দরজা খুলে ডাক্তারবাবু নেমে যাচ্ছিলেন। বিজনবাবু তাঁর পকেটে হাত দিয়ে পাঁচ টাকার একখানি নোট বের করে বললেন—আপনার এই ইয়েটা ধরুন।

ডাক্তারবাবু হাত নেড়ে বললেন—ক্ষেপেছেন! ও আপনি রেখে দিন। নমস্কার।

বলে তিনি তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে পড়লেন। সোফার গাড়ি ফেরাল।

ডাক্তারবাবুর সঙ্গে বিজনবাবুর কথাবার্তা বোধ করি সে সবই শুনেছিল। তাই রতনপুর না গিয়ে গাড়িখানা সে নিয়ে যাচ্ছিল সুখচরের দিকে।

বিজনবাবু মাথা হেঁট করে বসেছিলেন বলে এতক্ষণ তা বুঝতে পারেননি। হঠাৎ মাথা তুলতেই দেখলেন, গাড়ি একেবারে সুখচরের কাছাকাছি এসে পৌঁছেচে। একবার হয়ত ভাবলেন, এসেই যখন পড়েছে তখন চলুক, কিন্তু পরক্ষণেই আবার কি যে মনে হলো কে জানে ড্রাইভারকে বললেন, গাড়ি তোমায় এদিকে কে আনতে বললে? রতনপুর চল।

ড্রাইভার গাড়ি থামাল।

বিজনবাবু বললেন—থামলে কেন?

সে বলল—ঘুরিয়ে নিচ্ছি। ইঞ্জিনটা একবার দেখি কি হলো।

কিছুই হয়নি। গাড়ি সে ইচ্ছা করেই বন্ধ করেছে। গাড়ি দেখে গ্রাম থেকে যদি কেউ তাঁকে নিতে আসে তো আসুক। গাড়ি থেকে নেমে ইঞ্জিনের চাকাটা সে একবার খুলে দেখলে। একবার এটা নাড়লে একবার সেটা নাড়লে, একবার এদিকে চাইলে একবার ওদিকে চাইলে বৃথাই ইতস্ততঃ করে খুব খানিকটা দেরী করে দিয়েও যখন দেখলে কারও আসবার কোন চিহ্নই নেই এখন সে গাড়িতে ষ্টার্ট দিয়ে রতনপুরের দিকে গাড়ি ফেরাল।

একে সে মাত্র তিরিশ টাকা মাইনের চাকর তার ওপর জাতিতে মুসলমান, বাবুর কাছে মুখ তুলে কোনোদিন কোন কথা বলতে পারেনি। আজও পারলে না। জমিদার বাড়িতে অনেকদিন ধরে তো চাকরি করছে।

প্রথমে এসেছিল ঘোড়ার গাড়ির সহিস হয়ে। তারপর হয় কোচ্‌ম্যান, তারপর বাবুদের নতুন মোটরের সঙ্গে কোলকাতা হতে যে শিখ ড্রাইভার এসেছিল তারই কাছে মোটর চালাতে শিখে আজ সে ড্রাইভার হয়েছে। গাড়ি নিয়ে সুখচরে আসা আজ তার নতুন নয়।

বিজনবাবুর স্ত্রীকে সে ভাল করেই চেনে, যে দিদিমণি আজ মারা গেল তাকেও চিনত। কাজেই দুঃখ আজ তারও বড় কম হয়নি। দিদিমণি কত যত্ন করে কতদিন তাকে খেতে দিয়েছে, আর কিছু নেবে কিনা জিজ্ঞাসা করেছে।

বিগত দিনের সব কথাগুলো ভাবতে ভাবতে ড্রাইভার রতনপুরে এসে পৌঁছাল বিজনবাবুর বাসা বাড়ির দরজায়। তিনি গাড়ি হতে নেমে গেলেন।

॥ তিন ॥

পরদিন প্রভাতে বিজনবাবু জমিদার বাড়ি যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন, এমন সময় প্রিয়দর্শন একজন আগন্তুক তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল।

বিজনবাবু মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলেন। বললেন—বেসো—কখন এলে ?

আগন্তুকের চোখে জল। ধরা ধরা গলায় বললে—এসে আমি আর দেখতে পাইনি····

এই বলে কিছুক্ষণ থেমে কোঁচার খুঁটে চোখ মুছে সে আবার বললে—আপনি চলুন একবার। মা বড় কাতর হয়েছেন।

সে কথার কোনও জবাব না দিয়ে বিজনবাবু তাঁর চাকরকে ডাকতে লাগলেন।

আজ্ঞে যাই বলে সুরেশ পাশের ঘর থেকে সাড়া দিল।

কিন্তু সে আসার আগে বিজনবাবু নিজেই সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন—কাছারি যাচ্ছি। ফিরতে একটুখানি দেরি হবে। আমার জামাই এসেছে। যখন যা দরকার হয় দিও।

বলেই আর তিনি সেখানে অপেক্ষা করলেন না। এ ঘরে এসে বললেন—বিনয়, তুমি থাকো আমি আসছি।

—ফিরতে কি আপনার খুব দেরী হবে ?

—না। বলে তিনি তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলেন।

জমিদারের কাছারী বাড়ি হতে বিজনবাবু যখন তাঁর বাসায় ফিরলেন, বিনয়ের স্নানাহার তখন শেষ হয়েছে।

সেদিনের বাংলা খবরের কাগজখানা নিয়ে বিনয় তখন হল ঘরের মেঝেয় পাতা বিছানার ওপর শুয়ে শুয়ে পড়ছিল। বিজনবাবু দরজা থেকে একবার উঁকি মেরেই চলে যাচ্ছিলেন। বিনয় তাঁকে দেখতে পেয়েই ধড়মড় করে উঠে বসলে।

বিজনবাবু বললেন—উঠলে কেন, উঠলে কেন? বিশ্রাম কর! আমি এইমাত্র এলাম। চট্ করে চারটি—

বলে কথাটা তাঁর অসমাপ্ত রেখেই তিনি তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।

বিনয় দেখলে, যে কথা বলতে সে এখানে এসেছে, এখন আর সে কথা তার উত্থাপন করা চলে না। বিকালে বললেই চলবে। খবরের কাগজখানা মেলে ধরে বিনয় আবার সেখানে শুয়ে পড়লে।

বিকালে নিজে কষ্ট করে কথাটা আর বিনয়কে বলতে হলো না। বিজনবাবুই বিনয়কে ডেকে পাঠালেন।

হল ঘরে বসে বসেই বিনয় চা খাচ্ছিল সুরেশ এসে সংবাদ দিলে—জামাইবাবু কর্তা একবার আপনাকে ডাকছেন।

বিনয় তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই বিজনবাবু বললেন—বোসো নিজে বসেছিলেন খাটের ওপর। গড়গড়ার নলটা ছিল তাঁর হাতে। বিনয় চেয়ারে গিয়ে বসতেই তিনি বললেন—শোনো বিনয়, এখন কিছু দিন তুমি থাকো গিয়ে সুখচরের বাড়িতে। তোমার শাশুড়ী ঠাকরুণ বুঝতেই ত পারছ।

এই বলে গড়গড়ার নলটা তিনি টানতে লাগলেন। বিনয় বললে —আমি কিন্তু একটা চাকরির যোগাড় করেছিলাম।

বিজনবাবু তাঁর ঠোঁটের ফাঁকে একটুখানি হেসে জিজ্ঞাসা করলেন—চাকরী! কোথায়?

বিনয় বললে—কোলিয়ারীতে।

—মাইনে কত টাকা!

বিনয় বললে—মাইনে সামান্যই। ষাট টাকা।

—ষাট টাকা। আচ্ছা বেশ সে ষাট টাকা তুমি আমার কাছ থেকে নিও।

বিনয় হেঁট মুখে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলে। তারপর আবার বললে—চাকরিটা পারমানেণ্ট্ হবার আশা ছিল।

বিজনবাবু আবার একটুখানি হাসলেন। বললেন—ও, আমার এই টাকাটা মনে করেছো টেম্পোরারী? না না তা নয়। তোমাকে ত আমি অনেকদিন থেকেই থাকতে বলছি। লোকে ঘরজামাই বলবে ভেবে তুমি থাকোনি তা জানি। কিন্তু এবার ত আর—

কথাটা বলতে গিয়ে বোধ করি হঠাৎ তাঁর লতার কথা মনে পড়ে গেল। কথাটা তিনি আর শেষ করতে পারলেন না। চোখ দুটো তার জলে ভরে এলো। পড়্ পড়্ করে জোরে জোরে গড়গড়ার নলটা তিনি টানতে লাগলেন।

বিনয় বোধ হয় তা বুঝতে পারলে না। বললে—আমি খোকার কথা বলছিলাম। মা কি আর ওইটুকু ছেলে মানুষ করতে পারবেন।

বিজনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—কেন, তোমায় মা কি কিছু বলেছেন নাকি?

বিনয় ঘাড় নাড়ল। বললে—আজ্ঞে না। তিনি কি আর কারও সঙ্গে মুখ তুলে কথা বলছেন। দিন রাত শুধু পড়ে পড়ে কাঁদছেন।

—ছেলেকে তাহলে দেখছে কে?

—পাড়ার মেয়েরা দেখা শোনা করে।

বিজনবাবু বললেন—তারা ত আর চিরকাল করবে না বাবা। তোমার মা-ই সব করবে দেখো।

বিনয় তার সেই পুরোণো কথাটাই আর একবার বললে—মা কি আর ওই অতটুকু ছেলে····

—একটা লোক রেখে দিতে বল ত তাও রেখে দিতে পারি।

বিনয় বললে—লোক কি আর তেমন যত্ন নেবে ?

বিজনবাবু চুপ করে কি যেন ভেবে বললেন—তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না বিনয়। কি বলতে চাও, খুলে বল দেখি ?

বিনয় বললে—ছেলেটাকে মানুষ করতে মার কষ্ট হবে। তাই বলছিলাম, ওকে যদি আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাই ত সেখানে আমার দুটো বিধবা বোন আছে—

বিজনবাবু ঘাড় নেড়ে নিষেধ করলেন। বললেন—না বাবা তা হবে না। বেঁচে যদি থাকে ত আমার যা কিছু বিষয় সম্পত্তির ও-ই মালিক। ওকে আমি কোথাও নিয়ে যেতে দেবো না বিনয়। সুখচরে ও তোমার মার কাছেই থাক্।

বিনয় বললে—তা বেশ। আপনি যখন বলছেন—

বিনয়বাবু বললেন—আমি ত বলছিই, তা ছাড়া তোমার মা ওকে ছাড়বে না দেখো।

বিনয় এবার অন্য কথা পারলো। বললে—আপনি যদি একবার সময় করে সুখচরে যান ত বড় ভাল হয়। আমি সেই জন্যেই এসেছি।

বিজনবাবু বললেন—আমি ? হ্যাঁ আমি একবার যখন যাব ভাবছি, কিন্তু এমনি মজা, এদিকে ঠিক সেই সময়টাতেই নানান কাজ এসে জুটছে।

—তাহলেও একটুখানির জন্যে আপনি একবার চলুন।

বিজনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার শ্বাশুড়ী-ঠাকরুণ কিছু বলছিলেন না কি ?

ঘাড় নেড়ে বিনয় বললে—আজ্ঞে না। পাড়ার মেয়েছেলেরা সবাই মিলে আমায় বললেন—তুমি একবার যাও, তাহলেই উনি আসবেন।

বিজনবাবু বললেন—হ্যাঁ যাব। কাল পরশুর মধ্যে আমি একবার যাব ভাবছি। আর গিয়েই বা কি হবে ছাই। যা হবার তা ত হয়েই গেছে।

এর পরে কারও মুখ দিয়ে কোনও কথা বের হলো না। দু'জনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

বিজনবাবু প্রথমে কথা বললেন—তুমি তা হলে আজই চলে যাও বিনয়। কাল পরশু যেদিন হোক আমি একবার যাব।

গড়গড়ার কলকেটা পালটে দেবার জন্যে চাকর ঘরে ঢুকছিল। বিজনবাবু বললেন—ড্রাইভারকে একবার গাড়ি নিয়ে আসতে বলত বাবা বিনয়কে সুখচরে পৌঁছে দিয়ে আসুক।

এই বলে তিনি খাট থেকে নেমে দেওয়ালের আয়রণ সেফটা একবার খুললেন। দশ টাকার দশখানি নোট বের করে বিনয়ের হাতে দিয়ে বললেন—এই একশ টাকা দিও তোমার শ্বাশুড়ী ঠাকরুণের হাতে। শ্রাদ্ধের খরচ যদি কিছু করতে হয় ত যেন তা করে। আর তুমি যেন এখন কিছুদিন কোথাও যেয়ো না বাবা।

বিনয় মাথা নেড়ে তার সম্মতি জানাল।

॥ চার ॥

বিনয় চলে যাবার চারদিন পরে সেদিন বৈকালে সুখচরে যাবার জন্যে বিনয়বাবু বোধকরি প্রস্তুত হয়েছিলেন। অনেকক্ষণ হতে গাড়ি নিয়ে ড্রাইভার দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। এমন সময় বিধাতার এমনি বিড়ম্বনা, পোস্টাপিস থেকে পিওন এসে হাতে একখানি টেলিগ্রাম দিয়ে গেল।

টেলিগ্রামখানি তিনি খুলে পড়লেন। টেলিগ্রাম এসেছে বর্ধমান হতে। পাঠিয়েছে মিতালীরাণী। তার বাবা মরণাপন্ন। বিজনবাবুকে যেতে হবে।

চাকরকে ঘরদোর সব দেখতে বলে বিজনবাবু তখনি নীচে নেমে এলেন।

গাড়িতে চড়ে ড্রাইভারকে বললেন—ষ্টেশনে চল। বর্ধমান যেতে হবে। মামলার দিন আছে।

রতনপুর ষ্টেশনে গিয়ে বিজনবাবু বর্ধমানের ট্রেন ধরলেন।

বিজনবাবু বর্ধমানে পৌঁছে দেখলেন—অমরবাবুর বাড়িটা থম্ থম্ করছে! বাইরে থেকে কারও সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। ঘোড়ার গাড়িটাকে বিদায় দিয়ে তাড়াতাড়ি তিনি ওপরে উঠে গেলেন।

বারান্দায় একটা চাকরের সঙ্গে দেখা। বিজনবাবু তার মুখের দিকে তাকাতেই সে থমকে দাঁড়াল। বললে—আসুন।

অজয়বাবু যে ঘরে থাকতেন সেই ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াতেই বিজনবাবু দেখলেন—ঘরের মেঝের ওপর মিতালীরাণী তার মাথার চুল এলিয়ে দিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদছে! অমরবাবুকে দেখতে না পেয়ে ব্যাপারটা যে কি ঘটেছে। এখনও তিনি বেঁচে আছেন না মরেছেন, বিজনবাবু ঠিক বুঝতে পারছিলেন না।

চাকরটা তাঁকে দরজার কাছে পৌঁছে দিয়েই চলে গেছিল। বিজনবাবুকে মিতালীরাণী তখনও দেখতে পায়নি। জুতা খুলে তিনি নিজেই ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। পায়ের শব্দ পেয়ে এতক্ষণে মিতালীরাণী মুখ তুলে চাইল।

এতক্ষণ যদি বা সে নীরবেই চোখের জল ফেলছিল, বিজনবাবুকে দেখে আর স্থির থাকতে পারল না। তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে চীৎকার করে কেঁদে উঠল।

অমরবাবু যে মারা গেছেন বিজনবাবু সে কথা এতক্ষণে বুঝতে পারলেন। সেইখানেই বসে পড়ে মিতালীরাণীর মাথাটা তিনি তাঁর কোলের ওপর তুলে নিয়ে বললেন—চুপ কর, চুপ কর মিতালী। তুমি এ রকম কাতর হলে কি চলে? ছি!

চুপ করতে তার বেশীক্ষণ সময় লাগল না। অমরবাবু বহুদিন ধরে মৃত্যুশয্যায় পড়েছিলেন। ঘটনাটা একেবারে অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। তিনি যে মরবেন সকলেরই তা জানা কথা।

মিতালী তেমনি তাঁর কোলে মাথা রেখে শুয়ে শুয়ে বললে—টেলিগ্রাম কখন পেয়েছিলে?

বিজনবাবু বললেন—বিকেল চারটে কি সাড়ে চারটে হবে।

মিতালী বললে—হুঁ, ঠিক সেই সময়েই বাবা মারা গেছেন। তোমাকে আর দেখতে পেলেন না।

কথাটা বলতে গিয়ে ঠোঁট দুটো তার কেঁপে উঠল। চোখ দিয়ে আবার দরদর করে জল গড়িয়ে এলো।

বিজনবাবু তার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন—কাঁদে না ছি! চুপ কর। বাপ-মা কি আর চিরদিন কারও থাকে। তাছাড়া তিনি এতদিন ধরে কষ্ট পাচ্ছিলেন, এ এক রকম ভালই হয়েছে। রোগ যন্ত্রণা থেকে তিনি নিষ্কৃতি পেলেন।

মিতালী চুপ করলো।

বিজনবাবু জিজ্ঞেস করলেন—মরবার সময় কি কিছু বলে গেছেন ?

ঘাড় নেড়ে মিতালী বললে—না। সকাল থেকে তাঁর কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমার মুখের দিকে চেয়ে-চেয়ে শুধু চোখের জল ফেলেছিলেন।

বিজনবাবু বললেন—শ্মশান থেকে লোকজন ফেরেনি বুঝি ?

মিতালী বললে—না' এখনও ফেরেনি।

—মুখাগ্নি কে করলে ?

—আমিই করলাম।

—তুমি বুঝি আগেই চলে এসেছ ?

—হুঁ !

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। বিজনবাবু আগে কথা বললেন। বললেন—ব্যাঙ্কে খবরটা জানিয়ে দিতে হবে তো ? টাকাকড়ি যা আছে।

মিতালী বললে—সে সব আমি আগেই করে রেখেছি। ব্যাঙ্কের টাকা তাঁর নাম থেকে তুলে আমি আমার নিজের নামে করে নিয়েছি। করবার মধ্যে উইলের প্রোবেট নিতে হবে। আর কিছু করবার দরকার হবে না।

এই বলে বিজনবাবুর কোল থেকে মিতালী তার মাথাটা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। বললে—সেই থেকে বসে আছ, হাত মুখ ধোবে এসো—চাকরগুলো গেল কোথায় ! জিতু ! জিতু !

হিন্দুস্থানী চাকর জিতু দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।

মিতালী বললে—ঠাকুরকে চা আনতে বল।

এবার তাদের কি করতে হবে স্বামী-স্ত্রী বসে বসে তারই পরামর্শ করল। অমরবাবুর পুত্র সন্তান নেই, কাজেই শ্রাদ্ধের আয়োজন যা কিছু তিন দিনের মধ্যেই করতে হবে। তারপর এ বাড়ীতে মিতালীর আর থাকা চলবে না। বাড়িতে ভাড়াটে বসাতে পারে ত ভালই আর না হয় বিক্রী করে দিলেও ক্ষতি নেই।

মিতালী বললে—তাড়াতাড়ি বিক্রী করতে গেলে দাম পাবে না, তার চেয়ে ভাড়া দেওয়াই ভালো। অন্য বাড়ির ভাড়া আদায়ের জন্য একজন কর্মচারী ত রয়েইছে।

অন্যমনস্কের মত বিজনবাবু বললেন—হুঁ।

তাঁর অন্যমনস্ক হবার কারণ—তিনি তখন ভাবছিলেন অন্য কথা। ভাবছিলেন, মিতালীরাণীকে এবার তাঁর সঙ্গে না নিয়ে গেলে আর উপায় নেই। রতনপুরের বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে। জানাজানি অবশ্য হবেই। তা হোক। হলেই বা আর কি করবেন।

জানাজানি সব দিক দিয়েই হবে। তাঁর স্ত্রী যে এখনও বেঁচে আছে ; মিতালীও সে কথা জানতে পারবে।

বিজনবাবু উঠে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞাসা করলেন—টেলিগ্রামের ফরম আছে ?

মিতালী বললে—আছে। কি হবে ?

—রতনপুরের বাবুদের একখানা টেলিগ্রাম করে দিই।

মিতালী বললে—এদিককার সব ব্যবস্থা করে দিয়ে আমি এবার তোমার সঙ্গেই যাব।

বিজনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—এদিককার ব্যবস্থা করতে ক'দিন লাগবে ?

মিতালী বললে—তিন দিনের দিন শ্রাদ্ধ যদি হয় তাহলে তোমায় এখানে সাতটা দিন অন্ততঃ থাকতেই হবে, তাছাড়া আরও কিছু কিছু কাজ ত আছে।

বিজনবাবু বললেন—বেশ, তবে সাত দিনের কথাই বলে দিই।

মিতালী বললে—হ্যাঁ সাত দিনের কম হবে না।

এই বলে একটুখানি থেমে মিতালী তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—আমার যাওয়ার কথাও কিছু লিখবে নাকি ?

বিজনবাবু একটু হেসে বললেন—পাগল হয়েছে। তোমার কথা কেউ এখনও কিছু জানেই না।

সাত দিন কিন্তু লাগল না; সাত দিন আগেই কাজকর্ম সব চুকে গেল।

বর্ধমানের বাড়িটা ভাড়া দেবার ব্যবস্থাই হলো।

বাড়ির দামী দামী আসবাবপত্র কতক বা বিজনবাবু বিক্রী করে দিলেন, আর কতক তিনি রেলে পাঠিয়ে দিলেন রতনপুর ষ্টেশনে। একজন ঝি আর একজন চাকর বহুদিন ধরে অমরবাবুর বাড়িতে চাকরি করছিল। দুজনমাত্র তাঁদের সঙ্গে যাবে।

অন্যান্য কয়েকজনকে মাইনের ওপর কিছু বখশিস্ দিয়ে বিদায় করে দেওয়া হলো।

বর্ধমান ষ্টেশনে গাড়ী রিজার্ভ করে বৈকালে তাঁরা ট্রেনে চড়লেন।

রতনপুরে ট্রেন এসে পৌঁছাল সন্ধ্যায়। রাত্রির অন্ধকারে তাঁরা বাড়ি ঢুকবেন—এই ছিল বিজনবাবুর ইচ্ছা।

টেলিগ্রাম পেয়ে গাড়ি এসেছিল।

কিন্তু এমনি দুর্দৈব্য, বাড়ির দরজায় গাড়ি থেকে যেই তাঁরা দুজনে হাত ধরাধরি করে নেমেছেন মুখ তুলে দেখলেন সামনে তাঁর জামাই দাঁড়িয়ে আছে।

অন্ধকারে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত কিছু দেখলে মানুষ যেমন চমকে ওঠে বিজনবাবু ঠিক তেমনিই একবার চমকে উঠেই জিজ্ঞাসা করলেন—বিনয়—তুমি!

বিনয় বললে—আপনার কোনও খবর না পেয়ে আমি এই এক্ষুণি এলাম সুখচর থেকে।

—এসো। বলে মিতালীর হাত ধরে সরাসরি তিনি ওপরে উঠে গেলেন।

॥ পাঁচ ॥

বিজনবাবু মহা বিপদে পড়লেন। বিনয়ের কাছে কি বলে যে মিতালীর পরিচয় দেবেন তাই ভাবতে লাগলেন। স্ত্রী বলে পরিচয় দিলে সুখচরে গিয়ে সে সেই কথাই বলবে এবং বলবামাত্র কাঁদতে কাঁদতে হয়ত তাঁর স্ত্রী এসে হাজির হবেন, তা হলেই সর্বনাশ!

কেলেঙ্কারীর আর শেষ থাকবে না। কন্যার শোকে একে ত বেচারা কাতর হয়ে আছে, তার ওপর এই সময় যদি সে জানে তার সতীন এসেছে তা হলে কি কাণ্ড যে করে বসবে তার কোনও স্থিরতা নেই। জানতে অবশ্য একদিন সে পারবেই, এসব কথা চিরদিন গোপন করে রাখা চলে না তা তিনি জানেন। তবে কিছুদিন পরে জানাজানি হলেই যেন ভাল হয়।

মিতালীরাণীর দিকে বিনয় ঘন ঘন তাকাচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করতেও পারছিল না উনি কে। অথচ জানবার কৌতূহলও তার কম নয়।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বিজনবাবু নিজেই বললেন—ইনি আমার এক বন্ধুর স্ত্রী। বন্ধুটি বিলেত গেছেন, উনি ছিলেন ওঁর বাবার কাছেও হঠাৎ বাবা মারা গেলেন, দেখা-শোনা করবার কেউ নেই, তাই কি আর করি, নিয়ে এলাম এইখানেই। মস্তবড় লোকের মেয়ে।

বিনয় বললে—আপনার সুখচর যাবার কথা ছিল গেলেন না—তাই মা বললেন—একবার দেখে এসো।

বিজনবাবু বললেন—হ্যাঁ যাব বলেই ত বেরিয়েছিলাম হঠাৎ ওখান থেকে টেলিগ্রাম পেলাম।

মিতালীরাণীর সঙ্গে বর্ধমান থেকে যে ঝি এসেছিল তাকে দিয়ে সে এখন তার বাক্স-বিছানা জিনিষপত্র সাজিয়ে গুছিয়ে সাবান তেল নিয়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকেছে।

বিজনবাবু জামা-কাপড় ছেড়ে হাত-পা ধুয়ে তামাক খেতে বসলেন।

বিনয় বললে—আপনি কাল একবার চলুন সুখচরে।

—কাল ? বিজনবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন—না, কাল যাওয়া আমার হতেই পারে না। তবে যাব দিনকতক পরে তুমি গিয়ে বলো।

বিনয় বললে—বাবা লিখেছিলেন—চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে তুমি ওখানে বসে রইলে, এদিকে টাকার অভাবে সংসার একেবারে অচল হ'য়ে বসে আছে।

—আমি লিখে দিলাম, মাসে তিরিশ টাকা করে আমি আপনাকে পাঠাব, আপনি ভাববেন না।

এই বলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিনয় মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

বিজনবাবু বললেন—হুঁ বেশ করেছ।

বলেই তিনি অন্যমনস্কের মত কি যেন ভাবতে ভাবতে গড়গড়ার নলটা মুখে দিয়ে পড়্ পড়্ করে টানতে লাগলেন।

বিনয়ের হাবভাব দেখে মনে হলো কি যেন সে বলতে চায়।

বিজনবাবু কিন্তু কিছুতেই তার মুখের পানে তাকালেন না। না তাকালেও কথাটা হয়ত সে এক সময় বলেত, কিন্তু মাথায় ঈষৎ ঘোমটা টেনে মিতালীরাণী ঘরে ঢুকতেই বিনয়ের মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল, কথাটা বলা আর তার হয়ে উঠল না।

পেছন ফিরে বিনয় চলে যাচ্ছিল, বিজনবাবু মিতালীরাণীর দিকে তাকিয়ে বললেন—ওকে দেখে আর ঘোমটা দিতে হবে না। ও আমার জামাই বিনয়।

মিতালীরাণী থমকে থেমে মাথার ঘোমটা তুলে দিয়ে বিনয়ের মুখের দিকে তাকাল। অনুচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল—ছেলে কেমন আছে ?

বিনয় হেসে বললে—ভাল আছে। আপনি সব জানেন দেখছি।

—ওঁর কাছে শুনেছি।

এমন সময় খাবার কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্যেই বোধ করি ঠাকুর এসে দাঁড়াল।

বিজনবাবু বললেন—আমাদের একটু দেরী হবে। বিনয় তুমি আর রাত করছ কেন? খেয়ে নাওগে যাও।

ঠাকুরের সঙ্গে বিনয় চলে গেল।

বিজনবাবু মিতালীর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন।

—হাসছো যে?

—একদিনেই—না একদিনও ত এখন হয়নি; আসামাত্র পাকা গিন্নি হয়ে গেলে দেখছি।

মিতালীও হেসে বলল—কেন, গিন্নি কি আমি নই নাকি।

বিজনবাবু বললেন—আমি ভাবছিলাম লজ্জায় হয়তো তোমার মুখ দিয়ে কথা বেরুবে না।

মিতালীরাণী একটু হেসে তাঁর পাশে গিয়ে বসল। বলল—এতদিন জমিদারী চালিয়েও এখনও তাহলে তুমি মানুষ চিনতে শেখনি।

—তা হবে। কিন্তু ওদের আমি কি বলেছি জানো? বলেছি, তুমি আমার এক বন্ধুর স্ত্রী।

—তা জানি। কেন স্ত্রী বলে পরিচয় দিতে লজ্জা হচ্ছে নাকি?

—লজ্জা কিসের?

—মিতালীরাণী বললে—আমি কুৎসিত, আমার চেহারা ভালো নয়, লজ্জা হওয়া স্বাভাবিক।

বিজনবাবু বললেন—তুমি কুৎসিত আর আমি বুঝি—।

কথাটা মিতালীরাণী তাঁকে শেষ করতে দিল না। বললে—পুরুষ মানুষ কুৎসিত কখনও হয় না, তা জানো? আমাদের দেশে রূপের বিচার শুধু মেয়েদের বেলায়। কিন্তু সেকথা যাক্। বন্ধুর স্ত্রী বলে কতদিন আমাকে লুকিয়ে রাখবে শুনি?

বিজনবাবু হেসে বললেন—যতদিন পারি!

মিতালীরাণী হাসতে হাসতে বললে—লোকে তাহলে কি বলবে জানো?

—কি বলবে?

মিতালী হাত বাড়িয়ে বিজনবাবুর মাথাটা তার মুখের কাছে টেনে এনে কানে কানে কি যেন বলে খিলখিল করে হেসে উঠল।

বিজনবাবু বললেন—তা বলুক।

—বা রে। আমার লজ্জা করে না? না না, ওসব হবে টবে না, আমি সব ফাঁস করে দেবো।

বিজনবাবু বললেন—এখন না, দিন কতক পরে।

দু'জনেই চুপ করে ছিল। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তেই মিতালীরাণী বললে—জামাইকে বল—লতার ছেলেটিকে কাল এখানে নিয়ে আসুক, আমি মানুষ করব।

লতা একটি ছেলে রেখে মরেছে এবং তাকে মানুষ করবার জন্য বিজন বাবু একজন স্ত্রীলোক নিযুক্ত করেছেন তাই জানে। আজ যে হঠাৎ সে এই কথা বলে বসবে বিজনবাবু তা ভাবতে পারেননি। বললেন—না গো না, এখন তুমি যেমন আছ তেমনি থাকো লক্ষ্মীটি! ছেলে মানুষ করতে হয় নিজের ছেলে মানুষ করো।

—যাঃ। বলে মৃদু একটুখানি সলজ্জ হাসি হেসে মিতালীরাণী সেখান থেকে উঠে গেল।

পরদিন সকালে শয্যা ত্যাগ করে বিজনবাবু ভাবলেন, বিনয়কে আজ ভাল করে বুঝিয়ে এখান হতে বিদায় করতে হবে। বুঝাতে হবে এই বলে যে, সে যেন মিতালীরাণীর কথা তার শাশুড়ী ঠাকরুণের কাছে গিয়ে না বলে। কামিনী পল্লীগ্রামের অশিক্ষিতা মেয়ে—ভালমন্দ কোনো কিছুই সে বুঝতে চাইবে না। বন্ধুর যুবতী স্ত্রীকে সে তার নিজের কাছে এনে রেখেছে তার পক্ষে এই যথেষ্ট।

কিন্তু বিনয়কে বলতে কিছুই হলো না। সে-ই উল্টে বিজনবাবুর জন্য অপেক্ষা করছিল। দোতলার বারান্দায় মার্বেল পাথরের একটা টেবিল পাতা ; টেবিলের দু'পাশে দুখানি চেয়ার। চাকর এসে এই টেবিলের ওপর ডাকের চিঠিপত্র খবরের কাগজ ইত্যাদি রেখে যায়। বিজনবাবু রোজ সকালে ওইখানে বসে চিঠিপত্র পড়তে পড়তে চা খান। এটাই তাঁর প্রাত্যাহিক নিয়ম।

সেদিনও তিনি সেই চেয়ারে গিয়ে বসবামাত্র চাকর এসে চা দিয়ে গেল। বর্ধমান থেকে যে চাকরটাকে তিনি সঙ্গে এনেছেন, তামাক সেজে কলকেয় ফুঁ দিতে দিতে গড়গড়াটা সে হাতের কাছে নামিয়ে দিল।

চিঠি সেদিন ছিল মাত্র একখানি। পড়তে বিশেষ সময় লাগল না। গড়গড়ার নলটা মুখে দিয়ে সবেমাত্র তখন তিনি বাংলা খবরের কাগজখানি খুলে ধরেছেন, এমন সময় কার যেন পায়ের শব্দে সহসা সচকিত হয়ে কাগজখানা নামিয়ে চোখ তুলে চাইতেই দেখেন—ধীরে ধীরে বিনয় কোন সময় তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

বিজনবাবু বললেন—বোসো।

বলে তিনি ফাঁকা চেয়ারটা দেখিয়ে দিলেন।

শ্বশুরের সামনে চেয়ারে বসতে বোধকরি বিনয়ের লজ্জা করছিল তাই সে তেমনি টেবিলের ওপর হাত রেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বললে—আজ আমি যাব এক্ষুণি।

যাক্ যাবার কথাটা তা হলে মুখ ফুটে তাঁকে আর বলতে হলো না। বিজনবাবু বললেন—হুঁ, কিন্তু ছাখো, এই যে আমার এই বন্ধুর স্ত্রীটিকে আমি এখানে এনে রেখেছি সেকথা তোমার শাশুড়ী ঠাকরুণকে আর বলো না। বুঝলে?

বিনয় বললে—আজ্ঞে না। কি দরকার আছে বলবার। না বললেই হলো।

বিজনবাবু বললেন—হ্যাঁ জানোই ত তাকে। কি না কি ভেবে বসবে—তার চেয়ে—

কথাটা তিনি আর স্পষ্ট করে বলে শেষ করতে পারলেন না। জামাইয়ের কাছে বলতে বোধহয় তাঁর লজ্জায় বাধল।

আর কিছু বলবার প্রয়োজন নেই ভেবে আবার তিনি তাঁর পরিত্যক্ত খবরের কাগজখানা তুলে ধরলেন, বিনয়কে তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পড়া আর তার হয়ে উঠল না। বললেন—ও গাড়ী ? ডাকো ড্রাইভারকে আমি বলে দিচ্ছি।

—ডাকছি। বলে মাথা হেঁট করে সসঙ্কোচে সে নিবেদন করল—আমার কিছু টাকার দরকার ছিল। বাবাকে পাঠিয়ে দিতাম।

—টাকা ? বিজনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার দরকার কত টাকা ?

বিনয় বললে—তা অন্ততঃ তিরিশটি টাকা হলেই চলবে।

বিজনবাবু ডাকলেন—সুরেশ।

চাকর সুরেশ কাছে এসে দাঁড়াতেই বিজনবাবু বললেন—বিনয়কে তিরিশটে টাকা দে। আর ড্রাইভারকে বলে দে গাড়ী নিয়ে সে যেন সুখচরে ওকে পৌঁছে দিয়ে আসে।

বিনয় চলে গেলে মিতালীকে নিয়ে বিজনবাবু পরমানন্দে বাস করতে লাগলেন।

মিতালী যে তাঁর বন্ধুর স্ত্রী সেই কথাই রতনপুরে প্রচারিত হয়েছে। অথচ তাঁদের দু'জনের আচার-ব্যবহার চাল-চলন

দেখে সে কথা কিছুতেই মনে করবার জো নেই! বাড়ির চাকর ঠাকুর দেখে অবাক হয়। আড়ালে-আড়ালে কাণাঘুষা করতে থাকে।

সম্বন্ধটা যে সত্যিই তাঁদের কি জানতে কার না আগ্রহ হয়। বর্ধমান থেকে যে চাকর ও ঝি তাঁদের সঙ্গে এসেছে, তারা নিশ্চয়ই জানে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করলে বলে না এবং বলে না বলেই সাধারণ লোকের কৌতূহল আরও বেড়ে যায়।

কথাটা এ কান সে কান হতে হতে অবশেষে একদিন রতনপুরের বাবুদের বাড়িতে গিয়ে পোঁছে গেল।

॥ ছয় ॥

বাবুদের বাড়িতে বাড়ির মালিক কর্তাবাবু এখন মারা গেছেন। থাকবার মধ্যে আছে তাঁর তিন ছেলে। তিন জনেই সাবালক হয়েছে। ম্যানেজার বিজনবাবু তাদের বাপের আমলের লোক। শ্রদ্ধাভক্তি সকলেই করে। কিন্তু মেজ ভাই কেমন যেন একটুখানি বদমেজাজী।

সে-ই একদিন বিজনবাবুকে হঠাৎ হাসতে হাসতে বলে বসল—আজ একবার ম্যানেজারবাবুর বাড়িতে আমরা বেড়াতে যাব।

বিজনবাবু বললেন—বেশ ত যেয়ো।

রাসবিহারী বললে—আপনার কোন্ এক বন্ধুর স্ত্রী আছেন না সেখানে?

বিজনবাবু বললেন—হ্যাঁ, আছেন।

—তাঁর হাতের রান্নাও খেয়ে আসতে হবে।

বিজনবাবু বললেন—তিনি রাঁধেন না।

—কে রাঁধে তাহলে?

—ঠাকুর আছে।

—ও। আচ্ছা দেখে ত আসব। তিনি আর কতদিন আপনার ওখানে থাকবেন?

বিজনবাবু বোধহয় একটুখানি রাগ করলেন। বললেন—তোমাকে এই এতটুকু দেখছি রাসু তোমার মুখে এসব কথা ভাল শোনায় না।

রাসবিহারী হাসতে হাসতে বললে—আমায় এতটুকু দেখেছেন বলে চিরদিনই কি আমি এতটুকু থাকব নাকি?

বিজনবাবু চুপ করে রইলেন।

রাসবিহারীর কথাবার্তায় আর কিছু না হোক বিজনবাবু বুঝতে পারলেন মিতালী যে তাঁর বন্ধুর স্ত্রী সেকথা তারা বিশ্বাস করেনি।

সকলেই ভেবেছে—সে তার বিবাহিতা স্ত্রী কিংবা ওই রকম একটা কিছু।

এই রকম কাণ্ড যে একটা ঘটবে বিজনবাবু তা জানতেন।

তা ঘটুক। এখন আর ওকে ভয় তিনি বড় একটা করেন না—এর জন্য বড় জোর না হয় তাঁর চাকরী যাবে।

রাসবিহারীর দিকে কটমট করে তাকিয়ে বিজনবাবু বললেন—দাঁড়াও, তোমার দাদাকে আমি বলছি, বড় ফাজিল হয়েছ তুমি—

রাসবিহারী হি-হি করে হাসতে লাগল। বললে—বলুন না! আমি ত অন্যায় কিছু করিনি। আমি শুধু জিজ্ঞাসা করেছি—উনি কতদিন থাকবেন আপনার ওখানে! ব্যস্ ওইতেই দোষ হয়ে গেল?

বিজনবাবু রাগে গুম্ হয়ে চুপ করে রইলেন।

রাসবিহারী হাসতে হাসতে চলে গেল।

বর্তমানে রতনপুর এস্টেটের মালিক মাত্র তিনজন। তিন ভাই।

বড় ভাই রাসবিহারী বি-এ পাশ করে আপাততঃ বাড়িতে বসে বিষয়কর্ম দেখতে আরম্ভ করেছে। মেজ ও ছোট দু'জনেই এখনও গ্রামের এণ্ট্রেন্স ইস্কুলে পড়ে।

এদের এক মামা কুমারবাবু কর্তার আমল হতে এইখানেই বাস করছেন। দেশে তার জমিজমা বাড়িঘর কিছুই নেই। কর্তা বিবাহ করেছিলেন নিতান্ত গরীবের বাড়িতে। কাজেই বিবাহের পর স্ত্রীও যেমন তার বাড়িতে এসেছিলেন সঙ্গে সঙ্গে তার ভাইও এসেছেন। স্ত্রীর অনুরোধে রতনপুরে তাঁর নিজের বাড়ির পাশে কুমারবাবুর জন্যে দোতলা একখানি চমৎকার বাড়ি তৈরী করে বিয়ে দিয়ে কিছু জমিজমা

টাকাকড়ি দান করে কর্তা নিজেই তাঁর স্থায়ী একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে গেছেন।

এই কুমারবাবুকে রতনপুরের প্রজারা কেউ বলে মামাবাবু কেউ বলে কুমার সাহেব।

কর্তা যা দান করে গেছেন কুমারবাবু কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট নন। কর্তার আমল হতেই তার ইচ্ছা রতনপুর এষ্টেটের ম্যানেজারী করা। কিন্তু ম্যানেজারী তো দূরের কথা, কর্তা তাকে ছোটখাটো একটা চাকরীও কোনদিন দেননি। চাকরির কথা উঠলেই তিনি বলতেন—তোমার অভাব কি হে? চাকরি তুমি করবে কোন দুঃখে?

স্ত্রীকে তিনি এই বলে বুঝাতেন যে, শালাকে চাকরি দিলে নানা লোকে নানা কথা বলবে। তার চেয়ে, যা দিয়েছি তাতে যদি তার না কুলোয় ত যখন যা প্রয়োজন হবে তা যেন সে কাছারি হতে নেয়।

কর্তা যতদিন বেঁচেছিলেন এমনি করেই এতদিন তিনি তাঁকে নিরস্ত করে রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর কুমার সাহেবের আর তর সইল না। বিজনবাবুকে তাড়িয়ে নিজে তাঁর সেই শূন্যপদ দখল করবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠল।

তবে বনবিহারী নিতান্ত নির্বোধ নয় বলেই রক্ষা তা না হলে এতদিন হয়ত আমরা দেখতে পেতাম, বিজনবাবুর জায়গায় কুমারবাবু রতনপুর এষ্টেটের ম্যানেজারী করছে।

বনবিহারীর মা তাকে কতদিন বলেছেন—হাঁরে তোর মামা যখন সবই জানে বলছে তখন আর কেন মিছামিছি এতগুলো টাকা পরকে দিচ্ছিস বল ত?

কথাটাকে বনবিহারী হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। বলেছে তাই হবে মা, আরও কিছুদিন দেখি।

এমনি দেখি দেখি করে চিরটা কালই হয়তো কাটিয়ে দিতে পারত, কিন্তু এবার বুঝি আর পারে না।

কর্তার উইলে তিনি লিখে গেছেন—দুশ্চরিত্র কর্মচারী তাঁর এষ্টেটে কেউ থাকবে না। চুরির অপরাধে ক্ষমা করবে বরং তাও ভালো, কিন্তু দুশ্চরিত্রের অপরাধ ক্ষমার্হ নয়। যদি কোনও কর্মচারীর কোনোদিন চরিত্রদোষ ঘটে ত তিনি যিনিই হউন না, নির্মমভাবে তৎক্ষণাৎ তাকে জবাব দেবে।

এমন সময় কুমার সাহেব ঘরে ঢুকে বনবিহারীব হাত ধরে টানাটানি করতে করতে বললে—চলো বাবাজী চলো তোমার ম্যানেজারের কাণ্ডখানাটা একবার দেখবে চলো।

বনবিহারী হেসে বললে—কি হচ্ছে মামাবাবু? কি দেখব?

—কি দেখবে? মামাবাবু হাসি থামিয়ে বললে—রতনপুরের এই এতটুকু ছেলে পর্যন্ত যা জানে তুমি তাও জান না।

বনবিহারীও গম্ভীর হয়ে গেল। বললে—খুলেই বল না মামাবাবু তোমার ও হেঁয়ালী আমি বুঝতে পারছি না।

কুমার সাহেব বললে—তোমার ম্যানেজার বিজনবাবু যে একটা বেশ্যা নিয়ে এসে তার সঙ্গে বাস করছেন—সে খবর রাখো।

বনবিহারী একটুখানি বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে তাকাল। কুমার সাহেবের কথায় বিশ্বাস সে কোনদিনই করে না, আজও করল না। তবু একবার জিজ্ঞাসা করলে—তুমি ঠিক জান মামাবাবু?

কুমার সাহেব একটু হেসে বললে—বিশ্বাস হলোনা, না? আচ্ছা প্রমাণ করবার ভার আমি নিলাম।

বনবিহারী বললে—আমি ত শুনেছি তিনি তাঁর বন্ধুর স্ত্রী!

কুমার সাহেব বললে—আজই তোমার সে ভুল আমি ভেঙ্গে দেবো।

বনবিহারী বললে—পারবে?

—নিশ্চয়।

—যদি না পারো!

—না যদি পারি ত আমি নাকখৎ দেবো।

বনবিহারী বললে—ভালো।

—শুধু ভালো বললে চলবে না বাবাজী—প্রমাণ যদি করতে পারি ত বল আমায় ম্যানেজার করবে?

বনবিহারী বললে—না, ম্যানেজার তোমায় আমি করব না, তবে য়্যাসিসটেণ্ট ম্যানেজার করতে পারি।

কুমার সাহেব জিজ্ঞাসা করলে—ম্যানেজার কে হবে তাহলে?

বনবিহারী বললে—বিজনবাবুকে যদি সত্যিই জবাব দিতে হয় তাহলে ম্যানেজার আমিই হব ভেবেছি।

সবিস্ময়ে বনবিহারীর মুখের দিকে তাকিয়ে কুমার সাহেব বললে—তুমি!

ঈষৎ হেসে বনবিহারী বললে—হ্যাঁ, আমি।

বিনয় সুখচরে ফিরে গেছে। মিতালীরাণী যে তাঁর এক বন্ধুর স্ত্রী সে কথা সে বিশ্বাস করেছে কিনা কে জানে। বিজনবাবুর শুধু সেই ভয় বিনয় যদি তার শাশুড়ীর কাছে তার সন্দেহের কথা প্রকাশ করে তা হলেই সর্বনাশ। কামিনী হয়ত লতার ছোট ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে এখ্খুনি এখানে এসে হাজির হবে এবং তাই যদি সে সত্যিই করে বসে তা হলে কেলেঙ্কারীর আর বাকী কিছু থাকবে না কিছু।

বিজনবাবু ভাবলেন—এইবার অন্ততঃ একটি দিনের জন্যও সুখচরে একবার তাঁর যাওয়া উচিত।

মিতালীরাণীকে বললেন—একটি দিনের জন্যে আমায় একবার ছুটি দিতে হবে রাণী।

মিতালী এর অর্থ ঠিক বুঝতে পারল না। বলল—কিসের ছুটি! কেন?

বিজনবাবু বুঝিয়ে বললেন যে, তাঁর বিষয় সম্পত্তি সংক্রান্ত একটা

ঝগড়া বেধেছে। সেই ঝগড়া মেটাবার জন্য কালই তাকে একবার সুখচরে যেতে হবে এবং খুব সম্ভব কাল আর তিনি সেখান থেকে ফিরতে পারবেন না। ফিরবেন পরশু দিন।

মিতালী বললে—বেশ যেয়ো। কিন্তু কালই ফেরবার চেষ্টা করো।

এত তাড়াতাড়ি যে সম্মতি পাবেন তা তিনি ভাবেননি। বললেন—নিশ্চয়ই চেষ্টা করব। কিন্তু বোধহয় হয়ে উঠবে না। লোকগুলো সব এক গ্রামের নয় ত, ডেকে তাদের একসঙ্গে জড়ো করতেই হয়ত একটা দিন কেটে যাবে। তা হোক—তা হলেও আমি চেষ্টা করব।

মিতালীরাণী বললে—নতুন জায়গা একা থাকব বুঝতেই ত পারছ।

বিজনবাবু হেসে বললেন—সেই জন্যে ভাবছিলাম তুমি হয়ত যেতেই দেবে না।

মিতালীরাণী বললে—তা কষ্ট হলে আর কি করব বল। তোমার বিষয় সম্পত্তির কাজ—আমি কি এতই বোকা নাকি?

বিজনবাবু আশ্বস্ত হয়ে চুপ করে কি যেন ভাবতে লাগলেন।

মিতালী বললে—আসবার সময় লতার ছেলেটাকে তুমি নিয়ে এসো। ছোট একটা ছেলে থাকলে সময়টা তবু আমার কাটবে ভাল।

বিজনবাবু দেখলেন প্রতিবাদ করে লাভ নেই। বললেন—আচ্ছা তাই হবে।

পরদিন সকালেই মোটরে চড়ে বিজনবাবু সুখচরে চলে গেলেন।

সুখচর বেশী দূরে নয়। আধঘণ্টার মধ্যেই তাঁর বাড়ির দরজায় মোটর গিয়ে দাঁড়াল।

এতদিন পরে স্বামীকে দেখবা মাত্র তাঁর স্ত্রী একমাত্র কন্যার শোকে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। বিজনবাবু চুপ করে থাকতে পারলেন না; তাঁরও, চোখ দুটো সজল হয়ে এল। মেয়েটা বেঁচে থাকলে এতক্ষণ

সে তার বাবার কাছে এসে দাঁড়াত। লতার অভাবে বাড়ি একেবারে আজ তার ফাঁকা হয়ে গেছে। শোকে সান্ত্বনা দেবার কেউ নেই। খানিক বাদে কামিনী নিজেই চুপ করলেন। উঠে বসে চোখ মুছে বললেন—সময় হলো আসবার ?

জবাবে বিজনবাবুর বলবার কিছুই নেই। বললেন—বিনয়কে দেখছি না, কোথায় গেল সে ?

কামিনী বললেন—কেন, তোমায় সে কিছু বলে আসেনি ?

ঘাড় নেড়ে বিজনবাবু বললেন—কই না !

কামিনী বললে—বাপ তার কিছুতেই ছাড়বে না, তাই সে বিয়ে করতে গেছে।

—বিয়ে ! বিজনবাবু কেমন যেন একটুখানি অবাক হয়ে কামিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন—আমাদের সঙ্গে সম্বন্ধ তাহলে ত তার এক রকম চুকেই গেল। যাকগে। হতভাগাকে এত করে বললাম তবু শুনলে না !

কামিনী জিজ্ঞাসা করলেন—কি বললে ?

—বললাম ছেলের মত তুমি থাকো তোমার শাশুড়ীর কাছে। টাকাকড়ি যখন যা দরকার হবে নিয়ো। আর তোমার ওই ছেলেই ত আমার সব কিছুর মালিক—তোমার ভাবনা কি।

—শুনে কি বললে ?

—কিছুই বললে না। চুপ করে রইলো। আসবার সময় তিরিশটে টাকা চেয়ে নিয়ে এলো।

কামিনী বললে—তা বেশ করেছ।

এই বলে খানিক থেমে তিনি আবার বললেন—আমাদের আর একটা যদি মেয়ে থাকতো ত তারই সঙ্গে বিয়ে দিতাম। ছেলেমানুষ বিয়ে না করতেই বা আমরা বলি কেমন করে ! কিন্তু ছেলে যদি নিতে আসে ? হ্যাঁগা কি করব তখন ?

বিজনবাবু বললেন—পাগল হয়েছ। ছেলে তুমি দেবে না কিছুতেই। ছেলে নিতে সে আসবে না, তুমি ভেবো না।

কামিনী বললে—ওইটুকুকে আঁকড়ে ধরে তবু আমি কোন রকমে তাকে ভুলে আছি। ছেলে নিয়ে গেলে আমি কিন্তু মরে যাব।

বিজনবাবু আবার বললেন—ছেলে তুমি দিয়ো না। কিন্তু কোথায় সে? নিয়ে এসো একবার দেখি।

কামিনী বললেন—তাও ভালো যে এতক্ষণ পরে একবার দেখতে চাইলে।

বলেই তিনি বোধ করি ছেলে আনবার জন্যেই সেখান থেকে চলে গেলেন।

ছেলেটি দেখতে মন্দ হয়নি। গায়ের রং ফরসা, ডাগর ডাগর চোখ; দেখতে অনেকটা লতার মতই।

বিজনবাবু বললেন—কি নাম রেখেছ?

—আমি ত খোকন বলে ডাকি। দাঁড়াও বাঁচুক আগে।

বিজনবাবু বললেন—বাঁচবে, বাঁচবে। একদিক দিয়ে ধরতে গেলে শালার কপাল ভাল। বাপের ত এক কণাকড়িও নেই, গরীবের ছেলে হয়েও মাতামহের সম্পত্তি পেয়ে বড়লোক হবে।

এত দুঃখেও কামিনী একটু হাসলেন। বললেন—হুঁ, বড়লোক না আরও কিছু। তোমারই বা কি এমন আছে যে তাই পেয়ে ও বড়লোক হবে?

বিজনবাবু বললেন—আছে গো আছে। ওর কপাল ভাল। আমি বলছি তুমি দেখো।

কামিনী কিন্তু বিশ্বাস করলেন না বললেন—যার মা নেই তার আবার সুখ।

॥ সাত ॥

বিজনবাবু সুখচর গেছেন শুনে অবধি কুমার সাহেব বনবিহারীর কাছে গিয়ে বলছিল চল, বাবাজি চল। তোমকে যা বলেছি সত্যি কিনা তা দেখবে চল

বনবিহারীর বোধ হয় লজ্জা করছিল। বললে—আজ থাক মামা, আর একদিন গেলেই চলবে।

প্রাণবেগে ঘাড় নেড়ে কুমার সাহেব বললে—না না—তা হয় না। আজকের মত সুযোগ আর পাব না। বিজনবাবু আজ বাড়ি গেছে। চল।

বলে একরকম জোর করেই তাকে সে নিয়ে চলল।

বিজনবাবুর বাসা বেশী দূরে নয়। হাটতলাটা পার হয়ে গিয়েই বড় একটি রাস্তার বাঁকে বিজনবাবুর চমৎকার দোতলা বাড়িখানা।

কুমার সাহেবের সঙ্গে স্বয়ং বড়বাবুকে আসতে দেখে বিজনবাবুর চাকর সুরেশ সসম্ভ্রমে হাত দুটি কপালে ঠেকিয়ে চুপ করে দাঁড়াল।

কুমার সাহেব সেদিকে ততটা ভ্রূক্ষেপই করলে না। বনবিহারীকে সঙ্গে নিয়ে সরাসরি ওপরে উঠে গিয়ে পেছনের দিকে তাকাল। ডাকল —সুরেশ।

সুরেশ তাদের কাছে এসে আবার একবার প্রণাম করলে।

কুমার সাহেব বললে—যা তো তোর মাকে গিয়ে বল্ দেখি — বাবুরা একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

সুরেশ ভেতরে চলে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে ফিরে যখন এল, দেখা গেল, তার পেছনে মিতালীরাণী নিজেও এসেছে।

নিজে আসবে কুমার সাহেব কিংবা বনবিহারী কেউই তা ভাবেনি।

বনবিহারী কেমন যেন একটুখানি অপ্রস্তুত হয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। ভাল করে মিতালীরাণীর মুখের দিকে সে একবার চাইতেও পারলে না। কিন্তু কুমার সাহেবের সে সব বালাই নেই। মিতালীরাণীর দিকে তাকিয়ে তাকে একটি নমস্কার করে সে প্রথমেই বললে—আসুন।

মিতালীও প্রতি নমস্কার করতে ভুলল না। নিঃসঙ্কোচে তাদের কাছে এসে বললে—কি দরকারে এসেছেন আপনারা বলুন ?

বনবিহারী জবাব দিতে না পেরে কুমার সাহেবের দিকে একবার তাকাল মাত্র।

কুমার সাহেব বললে—অনেক কথা আছে। আপনাকে একটুখানি বসতে হবে।

বারান্দায় একটা মার্ব্বেল টেবিলের পাশে কয়েকটা চেয়ার পাতা ছিল। তারই একটায় নিজে বসে মিতালীরণী আরও দুটো চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে তাদেরও বসতে বললে।

—কুমার-সাহেব বনবিহারীর দিকে আঙুল বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—ওঁকে চেনেন ?

একটু হেসে মিতালীরাণী বললে—কেমন করে চিনব বলুন ? কখনও দেখেছি বলে ত মনে হয় না।

কুমার-সাহেব বললে—ইনিই এখানকার জমিদার। বনবিহারী বাবু।

মিতালী আবার একটি নমস্কার করে বললে —ও, হাঁ, আপনার নাম শুনেছি।

কুমার-সাহেব জিজ্ঞাসা করলে—বিজনবাবু আসছেন কবে ? কিছু জানেন আপনি ?

মিতালী বললে—কাল আসবেন।

কুমার-সাহেব বললে—এখানে আসবার আগে আপনি কোথায় ছিলেন বলুন ত ?

মিতলী বললে—ছিলাম বর্ধমানে।

—বর্ধমানে ? সেইখানেই কি আপনি চিরকাল—

—আজ্ঞে হ্যাঁ—বল্যাবধি আমি সেইখানেই মানুষ।

কুমার-সাহেব বললে—তা বেশ। কিন্তু এই যে বিজনবাবুর সঙ্গে আপনি এখানে চলে এলেন, নানান লোকে নানা কথা ত বলতে পারে! আসা আপনার উচিত হয়নি।

মিতালী তার ঠোঁটের ফাঁকে একটু হেসে বললে—আমি বুঝতে পেরেছি কেন আপনারা এখানে এসেছেন।

কুমার-সাহেবও হাসল। বললে—কেন এসেছি—কই বলুন দেখি ?

মিতালী বললে—আপনারা শুনেছেন আমি তার বন্ধুর স্ত্রী। সে কথা আপনারা বিশ্বাস করেননি—তাই ত ?

কুমার-সাহেব বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ বিশ্বাস করিনি। সত্যি কথা বলতে কি, বিশ্বাস করবার কথাও নয়।

মিতালী জিজ্ঞাসা করলে—কেন ? তাহলে আপনারা কি ভেবেছেন শুনি ?

কুমার-সাহেব নিঃসঙ্কোচে বলে ফেলল—ভাবছি আপনি ঠিক যা তাই ভেবেছি, অন্য কিছু ভাবিনি।

মিতালী এবার উঠে দাঁড়াল। দৃপ্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে—কি আমি ?

কুমার-সাহেবের এইবার বনবিহারীর দিকে ফিরে হেসে বললে—গ্যাখো।

বনবিহারী অনেকক্ষণ থেকেই মাথা হেঁট করে চুপ করে বসেছিল। এবারও সে মুখ তুলে চাইতে পারল না।

মিতালী আবার বললে—কই, আমার কথার জবাব দিলেন না ?

কুমার-সাহেব বললে—থাক আর জবাব দেবার দরকার নেই। আমাদের কাজ হয়ে গেছে। ওঠো বাবাজী ওঠো।

এই বলে বনবিহারীকে নিয়ে এখন সে যেন চলে যেতে পারলে বাঁচে।

বনবিহারীও অনেকক্ষণ থেকে উঠি উঠি করছিল। কুমার-সাহেবের কথাটা শেষ না হতেই সে উঠে দাঁড়াল।

মিতালী আবার জিজ্ঞাসা করল—কই আমার কথার জবাব ত আপনি দিয়ে গেলেন না? বলুন আমি কি?

কুমার-সাহেব ও বনবিহারী দু'জনেই তখন উঠে দাড়িয়েছে। কুমার সাহেব মুখ ফিরিয়ে বললে—আপনি দুশ্চরিত্রা, আপনি ভাল মেয়ে নন।

কথাটা শুনে মিতালীর হাত-পা থর থর করে কাঁপতে লাগল। রাগে তার মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল।

বাড়ি ফিরেই কুমার সাহেব বনবিহারীকে ধরে বসল—নাও, লেখো একখানা চিঠি।

—কাকে লিখব?

—বারে! কাকে লিখব? এতক্ষণ ধরে তবে আর তোমাকে বলছি কি! লেখো—বিজনবাবুকে। লেখো—এখানে আপনার আর চাকরী করা চলবে না। বাবার উইলের সতেরো নম্বরের সর্ত অনুসারে আপনাকে আমি ডিস্‌মিস্ করলাম।

বনবিহারী বললে—কিন্তু মেয়েটি ত কই নিজের মুখে কিছুই বললেন না। তুমি যা বলছ তা নাও হতে পারে।

কুমার সাহেব হো হো করে হেসে উঠল। বললে—নিতান্ত

ছেলেমানুষ তুমি বাবাজি নিতান্ত ছেলেমানুষ। মেয়েরা নিজ মুখে কখনও বলতে পারে সে খারাপ ? ধরে নিতে হয়। হাব ভাব কথাবার্তা চাল চলন দেখে বুঝে নিতে হয়।

বনবিহারী বললে—আমি ত সত্যি বলছি মামা কিছু বুঝতে পারলাম না।

কুমার-সাহেব বললে—আচ্ছা সে যে বিজনবাবুর বন্ধুর স্ত্রী নয় তা বুঝতে পেরেছ ?

বনবিহারী বললে—হ্যাঁ তা যেন মনে হলো।

কুমার সাহেব বললে—তাহলে কি তুমি বলতে চাও—উনি বিজন বাবুর বিয়ে করা স্ত্রী ?

—তাও হতে পারে।

—আচ্ছা বেশ ধরো তাই। সুমুখের টেবিলটা সজোরে একবার চাপড়ে কুমার সাহেব চেয়ারটা টেনে নিয়ে ভাল করে চেপে বসল। বললে—তাই যদি হয়, তাহলে বিজনবাবুকে তুমি কি বলবে ? দুশ্চরিত্র বলবে কিনা। বাড়িতে তাঁর স্ত্রী আছে, পুত্র নেই কিন্তু কন্যা ছিল। কন্যার একটা ছেলেও হয়েছে শুনেছি। এ অবস্থায় বুড়ো বয়সে যে লোক আবার একটা মেয়েমানুষ বিয়ে করেই হোক আর না করেই হোক—বাড়িতে এনে রাখতে পারে, তাকে কি বলবে তুমি ? খুব ভাল মানুষ না ?—নাও, লেখো তুমি লেখো।

এই বলে সে নিজেই উঠে গিয়ে ঘরের ভেতর হতে ছাপানো একখানা চিঠির কাগজের প্যাড ও দোয়াত কলম এনে বনবিহারীর হাতের কাছে নামিয়ে দিল।

তখন বনবিহারী লিখতে ইতস্ততঃ করছে দেখে কুমার সাহেব বললে —আমার কথাবার্তা শুনে ভাবছ বুঝি ওকে তাড়িয়ে আমি নিজে ম্যানেজার হতে চাই বলেই আমার এত—

ঈষৎ হেসে বনবিহারী বললে—না না তা ভাবিনি। ভাবছি—

কাজটা ভাল হবে কি না। আমরা একরকম ধরতে গেলে এ স্টেটের বিশেষ কিছুই জানি নে। উনি অনেক পুরানো লোক। ছেড়ে গেলে এস্টেটের যদি ক্ষতি হয়—আমি শুধু তাই ভাবছি, আর কিছু না।

কুমার সাহেব বললে—দ্যাখো বাবাজি আমি তোমার মামা। আমি কখনই চাইব না যে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাও—কি তোমাদের এতটুকু ক্ষতি হোক্। তোমাদের ভাল হলেই আমার ভাল।

কিন্তু ওই যে বিজনবাবু—উনি তোমার কেউ নন। তোমাদের ওপর ওঁর মমতা কোনোদিনই হতে পারে না। তুমি ডুবলে ত ওঁর ভারি বয়েই গেল।

উনি চাইবেন ওঁর নিজের স্বার্থ। চাইবেন—তোমাদের মেরে নিজে বড়লোক হতে।

কথাটা বোধ করি তখনও শেষ হয়নি।

বনবিহারী বললে—কিন্তু কই, আজ পর্যন্ত আমাদের অনিষ্ট ত কিছু করেননি।

কুমার সাহেব আবার একবার তেমনি হো হো করেই হাসল। বললে—তোমাকে দেখিয়ে করবে বুঝি? তোমাকে বুঝিয়ে বল্‌বে বুঝি, এই তোমার ক্ষতি করলাম বনবিহারী, তুমি বাবা কিছু মনে করো না। একবার ওকে ছাড়িয়ে দাও—তারপর আমি তোমাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবো ও তোমার কত নিয়েছে। নাও আর দেরী ক'রো না—লেখো।

লেখো—আপনি নিজে এসে আমাকে সব চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে যান। এসে পড়লে তখন আর চক্ষুলজ্জায় কিছু বলতে পারবে না। সে জন্যেই আমার এত তাড়াতাড়ি।

শেষ পর্যন্ত নিরূপায় হয়ে বনবিহারীকে লিখতে হলো।

লিখতে হলো :

বাবার উইলের কথা আপনি সবই জানেন। তারই সতেরো নম্বর সর্তটি পালন করবার জন্যে আমি আপনাকে দুঃখের সঙ্গে লিখতে বাধ্য হলাম যে আপনি অবিলম্বে আপনার পদত্যাগ পত্র দাখিল করে আমাকে আপনারসমুদয় চার্জ বুঝিয়ে দেবেন।

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমি এই পত্রখানি আপনাকে লিখছি। এর জন্যে আপনাকে এক সপ্তাহ সময় মঞ্জুর করা হলো। নিবেদন ইতি।

কুমার সাহেব চিঠিখানি পড়ে তৎক্ষণাৎ একটি খামে পুরে নিজেই বিজনবাবুর নাম ঠিকানা লিখতে লিখতে বলতে লাগল—দুঃখের সঙ্গে কেন ? লিখতে বাধ্য হলামই বা কি জন্যে ? আমার জমিদারী আমার সব তুমি আমার কর্মচারী তোমাকে আমি আর চাই না—ব্যস ফুরিয়ে গেল কথা। আচ্ছা যাক্ যা লিখেছ তাই লিখেছ এটা এখন পাঠিয়ে দিই।

এই বলে চিঠিখানি হাতে নিয়ে কুমার সাহেব আনন্দে ঠিক যেন নাচতে নাচতে সেখান থেকে চলে গেল। আর বনবিহারী সেখানেই, সেই টেবিলের গায়ে হাতের ওপর মাথা রেখে বসে বসে ভাবতে লাগল।

চিঠিখানি সুখচরে বিজনবাবুর হাতে গিয়ে পৌঁছল সেইদিনই সন্ধ্যায়। তাঁর স্ত্রী তখন সবেমাত্র তুলসীমঞ্চে সন্ধ্যাপ্রদীপ দিয়ে দেবতার কাছে স্বামীর মঙ্গল কামনা করে ঘরে ফিরছিলেন। বিজনবাবু হাসতে হাসতে বললেন—ওগো শুনছো রতনপুর থেকে লোক এলো চিঠি নিয়ে, আমার চাকরী গেছে।

কামিনী একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো। বললেন—সে কি গো ! আমার হাত পা যে থর থর করে কাঁপছে।

কামিনী বললেন—তুমি হাসছ কেমন করে কে জানে, এই চাকরীই ত আমাদের একমাত্র ভরসা। চাকরী গেলে চলবে কেমন করে শুনি ?

বিজনবাবু বললেন—চলবে। সে ব্যবস্থা আমার আছে তুমি ভেবো না।

কামিনী ভাবলেন তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে স্বামী তাঁকে মিথ্যা বলছেন।

বিজনবাবুকে চাকরী জবাবের চিঠিখানা দিয়েও কিন্তু কুমার সাহেবের মন ভরল না। এই মেয়েটির কথা বিজনবাবুর স্ত্রী এখনও নিশ্চয় জানেন না, কথাটা তাকেও জানানো প্রয়োজন। তবে এ চিঠি বনবিহারীকে দিয়ে না লিখলেও চলবে। কুমার সাহেব নিজেই লিখল—

শ্রীচরণেষু—

আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে রতনপুর এষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বাবু বিজন চট্টোপাধ্যায় কিছুদিন আগে একটি স্ত্রীলোককে তাঁর বাসায় এনে রেখেছেন। এ সংবাদ আপনি জানেন কি না আমরা জানি না। সেইজন্য আপনার মঙ্গলের জন্যেই আপনাকে জানাচ্ছি যে, ভদ্র স্ত্রীলোকটি বিশেষ ভদ্রবংশের বলে মনে হয় না। আপনি যদি অবিলম্বে এর কোন প্রতিবিধান না করেন, তা হলে ব্যাপারটা ভবিষ্যতে হয়ত আপনার আয়ত্ত্বের বাইরে চলে যাবে।

আপনি এই স্ত্রীলোকটিকে অপমান করে যদি তাড়িয়ে দিতে পারেন আপনাকে আমরা প্রাণপণ শক্তিতে সাহায্য করব। নিবেদন ইতি—

রতনপুরের প্রজাবর্গ।

চিঠিখানি পড়ে কামিনী কি যে করবেন কিছুই বুঝতে পারলেন না। স্বামীর চাকরী গেছে বলে একে ত তাঁর মনের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। তার ওপর এই চিঠি। কোন দুষ্ট লোকের কাজ নয়তো!

চিঠিখানি তিনি আবার একবার ভাল করে পড়লেন। পড়ে তাঁর দু'চোখ জলে ভরে গেল, হাত পা থর থর করে কাঁপতে লাগল।

রতনপুরে যদি তাঁকে যেতেই হয় একা সেখানে কেমন করেই বা

যাবেন ! জামাই বাড়িতে নেই। থাকলে তাকেই তিনি সঙ্গে নিয়ে যেতেন।

পাশের বাড়িতে পরেশ বলে একটি ছোকরা থাকে। ছেলেটি তাঁর বড় অনুগত। কামিনী তাকেই ডেকে পাঠালেন।

পরেশ এলে বললেন—আমাকে আজই একবার রতনপুরে নিয়ে যেতে পারিস বাবা ?

পরেশ তাঁকে মা বলে ডাকে। বললে—কেন পারব না মা ?

—তাহলে এক কাজ কর বাবা একখানা গরুর গাড়ি ঠিক করে নিয়ে আয়। আমি ততক্ষণ খোকাকে কিছু খাইয়ে নিই।

পরেশ জিজ্ঞাসা করল—কিন্তু হ্যাঁ মা, বাবু ত কাল এসেছিলেন শুনলাম। আজ আবার হঠাৎ এমন কি দরকার পড়ল যে আপনাকে যেতে হবে ?

চিঠির কথা কামিনী তার কছে গোপন করলেন। বললেন—হ্যাঁ বাবা দরকার পড়েছে। গাড়ি একখানা তুই নিয়ে আয়।

পরেশ বোধকরি গাড়ি আনতেই গেল।

॥ আট ॥

বনবিহারীর কাছে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে বিজনবাবু তখন সবেমাত্র বাসায় এসে আহারাদি শেষ করে বোধকরি একটুখানি বিশ্রাম করছিলেন।

শিয়রের কাছে মিতালীরাণী বসে বসে গল্প করছিল।

মিতালী বললে—বেশ করেছ চাকরী ছেড়ে দিয়েছ। ছি ছি, এখানে চাকরী আবার মানুষে করে! কাল ওই ফর্সা মত বেঁটে লোকটার কথা শুনে আমার কি যে মনে হয়েছিল সে আর তোমাকে কি বলব।

বিজনবাবু বললেন—ও-ই বনবিহারীর মামা। লোকটা চিরকালই এমনি। কিন্তু চাকরী ত গেল এবার কি করি বল ত? তোমার এষ্টেটে আমাকে ম্যানেজার রাখবে?

এই বলে মিতালীর মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি হাসতে লাগলেন।

মিতালী হেসে কি একটা যেন জবাব দিতে যচ্ছিল এমন সময় সুরেশ এসে সংবাদ দিল নীচে গরুর গাড়িতে চড়ে কে একজন মেয়ে মানুষ একটি ছোকরাকে সঙ্গে নিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

—মেয়েমানুষ?

সুরেশ বলল—আজ্ঞে হ্যাঁ, কোলে একটি ছোট ছেলে রয়েছে।

বিজনবাবু তাড়াতাড়ি খাটের ওপর উঠে বসলেন।

এল যে সে কমিনী—বিজনবাবুর প্রথমা পত্নী। আজই সকালে তিনি সুখচর হতে ফিরলেন, এরই মধ্যে বাড়িতে তাঁর এমন কি বিপদ ঘটল যার জন্য স্ত্রীকে তাঁর এমন করে ছুটে আসতে হয়েছে কে জানে।

যাই যোক বিজনবাবু তৎক্ষণাৎ নিজেই তাড়াতাড়ি কামিনীর কাছে

গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি আবার কি জন্যে এলে—এতটুকু এই ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে ?

কামিনী বললেন—কেন আমার কি আসতে নেই নাকি ? এলামই বা তোমার বাড়ি দেখতে।

এই বলে তিনি বাড়িটার এদিক-ওদিক চাইতে লাগলেন।

বিজনবাবু বললেন—না, না ওসব মিছে কথা। তুমি বল কি জন্যে এসেছ ! আমি সত্যি কথা শুনতে চাই।

কথাগুলো তিনি বেশ জোরে জোরেই বললেন। কামিনীর মুখখানি তখন ভয়ে শুকিয়ে গেছে। ছেলেটা কোলে রয়েছে বলে নিজের আঁচলের খুঁটটা ইসারায় দেখিয়ে দিয়ে বললেন—ওইখানে একখানি চিঠি বাঁধা আছে খুলে পড়, তাহলেই বুঝতে পারবে।

বিজনবাবু তাঁর কাপড়ের খুঁট থেকে নিজেই চিঠিখানি খুলে বের করলেন—কিন্তু পড়তে গিয়ে মুখের চেহারা তাঁর বদলে গেল।

সর্ব্বনাশ !

এ ঠিক সেই মামাবাবুর কাজ। কুমার সাহেব ছাড়া এ কাজ আর কারও দ্বারা সম্ভব নয়।

বিজনবাবু জোর করে টেনে টেনে হাসতে লাগলেন। বললেন—পাগল ! এসব কথা তুমি বিশ্বাস কর ! তবে হ্যাঁ—সবটা সত্যি না হলেও খানিকটা সত্যি। দেখবে ! দাঁড়াও তোমাকে দেখাই।

বলে তিনি সেইখানে দাঁড়িয়ে ডাকতে লাগলেন—মিতালী ও মিতালী !

খানিক পরে মিতালী সাড়া দিল যাই।

বিজনবাবু বললেন—আমার এক বন্ধুর মেয়ে আর বন্ধুর স্ত্রী। বন্ধু বিদেশ গেছে আর ঠিক সেই সময় ওঁর বাবা গেলেন মরে, তাই উনি আমার কাছে এসে কয়েকটা দিনের জন্যে রয়েছেন মাত্র। ওঁকে তুমি স্বচক্ষেই—এই যে এসো।

কথাটা শেষ হবার আগেই মিতালী এসে দাঁড়ালো।

বিজনবাবু তাকে দেখিয়ে বললেন—এই ইনি আমার বন্ধুপত্নী—বন্ধুকন্যা। এ চিঠি কে লিখেছে আমি বুঝতে পেরেছি। সে লোকটা এখানেও এসেছিল শুনছি।

যাক আমি চাকরী ছেড়ে দিয়েছি। এখন আর ওদের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। নইলে তাকে আমি একবার ভাল করে দেখে নিতাম।

মিতালী ততক্ষণ কামিনীর কোলের ছেলেটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিলো।

বললে—এইটি বুঝি লতার ছেলে?

কামিনী বললে—হ্যাঁ।

বলতে গিয়ে চোখ দুটো তাঁর সজল হয়ে এল।

মিতালী হাত বাড়িয়ে এসো বলতেই খোকা তাব কোলে আসতে কোন দ্বিধা সঙ্কোচ করল না।

খোকাকে কোলে নিয়ে মিতালীরাণী আদর করছিল। সেই অবসরে বিজনবাবু কামিনীকে একটুখানি দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বললেন—এখানে এমন চট করে চলে আসাটা উচিত হয়নি। লোকে বলবে কি। ছি।

কামিনী আর যা-ই করুন স্বামীকে বিশ্বাস করেন ঠিক দেবতার মতই। বললেন—ওগো শোন। তাহলে এক্ষুণি আমি চলে যাই, বুঝলে। চিঠি পেয়ে আমার মাথার ভেতরটা কেমন যেন করতে লাগলো, অই চলে এলাম। ঘর-দোর এমনি ফেলে ছড়িয়ে দিয়ে এসেছি। আমি যাই তাহলে বুঝলে?

এই বলে হেঁট হয়ে স্বামীকে একটা প্রণাম করে পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—কিন্তু হ্যাগা চাকরী গেল এবার কি করবে?

—সে আমি তোমায় জানাব, তুমি ভেবো না। বলে কামিনীকে আশ্বাস দিয়ে বিজনবাবু সুরেশকে ডাকতে লাগলেন।

সুরেশ কাছে এসে দাঁড়ালে বললেন—ড্রাইভারকে বলে মোটরটা ঠিক করে দাও। গরুর গাড়িতে ছেলে নিয়ে বড় কষ্ট হবে।

সুরেশ তৎক্ষণাৎ মোটর ঠিক করে আনলে। মিতালীরাণী কামিনীকে কিছু না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়ল না। ছেলেকে দুধ খাইয়ে সঙ্গের ছেলেটিকে ও কামিনীকে জলযোগ করিয়ে মিতালী নিজে গিয়ে তাদের মোটরে তুলে দিয়ে এলো।

মোটর ছেড়ে দিল। ফাঁকা গরুর গাড়িটাকে আগেই বিদায় করে দেওয়া হয়েছে।

নীচে থেকে মিতালী ওপরে উঠে এসে দেখল বিজনবাবু হেঁট মুখে পায়চারী করছেন। কাছে সুরেশ দাঁড়িয়ে। মিতালী আসতেই বিজনবাবু বলে উঠলেন—শুনেছ? মোটর ওরা প্রথমে দিতে চায়নি। সুরেশ অতি কষ্টে মোটর নিয়ে এসেছে।

মিতালী সুরেশকে সেখান হতে চলে যেতে বলে বিজনবাবুর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বললে—কালই তুমি নতুন একখানা মোটরের অর্ডার দাও না। কতই বা লাগবে? মোটর কিনে ওদের দেখিয়ে দাও যে ইচ্ছে করলে তুমিও মোটর কিনতে পার।

বিজনবাবু বললেন—আমিও তাই ভাবছি। কিন্তু এখন ওরা কি ভাববে জানো? ভাববে ওদেরই এষ্টেটের টাকা আমি চুরি করেছি।

মিতালীরাণী বললে—ভাবুক। কিন্তু হ্যাঁগো,বোসো বলি।

বলে বিজনবাবুকে হাতে ধরে একটা সোফার ওপর বসিয়ে নিজেও তার পাশে বসে মিতালী বললে—দিদি যে এখনও বেঁচে আছে সে কথা তুমি আমায় জানাওনি কেন?

বিজনবাবু চুপ করে রইলেন। মিতালীর চোখ দুটো ছল ছল করতে লাগল। তা সত্ত্বেও মুখে সে তার হাসি টেনে বললে—চল

এবার আমরা তাহলে বর্ধমানেই যাই। ভাড়াটেদের বলে দিলেই হবে—আসছে মাস থেকে....

বিজনবাবু কথাটা তাকে শেষ করতে দিলেন না। বললেন—বর্ধমানে থাকতে তোমার ভাল লাগে? ও-টাউনে ত শুনেছি ভয়ানক ম্যালেরিয়া হয়।

মিতালী বললে—আগে হতো তখন আর হয় না। বর্ধমানে থাকতে ভাল লাগে মানে? ছেলেবেলা থেকে ত ওখানেই আছি।

বিজনবাবু বললেন—তা বেশ চল সেখানেই যাই। যেখানে হোক এক জায়গায় থাকতে তো হবেই।

মিতালী বললে—আমার কিন্তু এক এক সময় কি ইচ্ছে করছে জানো? মনে হচ্ছে—এইখানেই কাছাকাছি কোথাও মস্ত একটা বাড়ি তৈরী করে জমিদারী কিনে তোমার ওই বাবুদের একবার দেখিয়ে দিই, আমরাও যে-সে লোক নই।

বিজনবাবু চুপ করে কি যেন ভাবছিলেন, মিতালী আবার বললে—তোমাকে জবাব দিয়ে, ওই যে মামা সাহেব না কি বলে—ও লোকটা ভেবেছে বুঝি খুব জব্দ করে দিলাম। এইখানেই কাছাকাছি কোথাও থেকে ওকে একবার অপমান করতে পারলে তবে আমার মন সুস্থ হয়।

বিজনবাবু বললেন—হুঁ।

মিতালীরাণী বললে—বাড়ি বয়ে এসে লোকটা আমায় অপমান করে গেছে। দিদিকে খবর দিয়ে ওই আনিয়েছে।

ভাবতে ভাবতে বিজনবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন—তোমার দিদিকে! হ্যাঁ, এ কাজ ও-ছাড়া আর কেউ করেনি।

মিতালী বললে— তুমি কিন্তু আচ্ছা শয়তান যা হোক। আমাকে বিয়ে করবার জন্যে বাবার কছে কেমন মিছে কথাটা বললে! দিদি বেঁচে রয়েছেন, অথচ তুমি বললে কিনা স্ত্রী আমার মরে গেছে! কই আমাকেও ত ঘুণাক্ষরে কোন দিন জানাওনি।

বিজনবাবু বললেন—লজ্জায় জানাতে পারিনি রাণী, তুমি কিছু মনে করো না। আমার অপরাধ হয়েছে।

—কিন্তু কেন তা করলে বলত? এটা কি তোমার খুব ভাল হলো?

বিজনবাবু আদর করে মিতালীরাণীকে কাছে টেনে এনে বললেন—তা নইলে তোমাকে কি আমি পেতাম রাণী? আমি কি আর সাধে বলেছি? বলেছি শুধু তোমাকে পাবার জন্যে।

মিতালী হেসে বললে—আমাকে ত নয় আমার টাকাকে, আমার বিষয় সম্পত্তিকে বল, তা হলেই সত্যি কথা বলা হবে।

বিজনবাবু ঘাড় নেড়ে না বলতে যাচ্ছিলেন—মিতালী তাকে বাধা দিয়ে বলল—থামো আর না বলতে হবে না। আমার চেহারা এমন কিছু ভাল নয় যে আমাকে পাবার জন্যে তুমি পাগল হয়ে গেছিলে। তা জানি আমি গো জানি, লেখাপড়া কিছু শিখেছি, বুঝতেও কিছু কিছু পারি।

বিজনবাবু হতভম্বের মত অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে হাঁ করে মিতালীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

মিতালী বললে—তা বেশ তার জন্যে তোমায় আমি দোষ দিচ্ছিনে। টাকা ছাড়া আমায় কেউ নিতো না তাও আমি জানি। আমি এত অবুঝ নই। কিন্তু হ্যাঁ-গা দিদি ত কিছুই জানলে না। আহা বেচারা যখন শুনবে তখন কি হবে? তার মনে খুব কষ্ট হবে ত! সেই কথাই ভাবছি আর কিছু ভাবিনি।

বিজনবাবু বললেন—সে কথা তোমায় ভাবতে হবে না রাণী। সে সব ভাবব আমি। এখন কোথায় যাওয়া যায় সেই কথাই ভাবি এসো।

মিতালী বললে—তা হলে চল কাছাকাছি কোথাও গিয়ে থাকিগে।

বিজনবাবু বললেন—কাছাকাছি থাকতে হলে রাণীগঞ্জে গিয়ে থাকতে হয়।

এখান থেকে মাইল পাঁচেক দূরে—বেশ বড় শহর।

মিতালী বললে—সেই ভালো। তা হলে কালই তুমি একবার সেখানে গিয়ে একটা বাড়ি ঠিক করে এসো।

শেষ পর্যন্ত তাই স্থির হলো। রাণীগঞ্জে গিয়ে বিজনবাবু একখানা ভাল বাড়ি দেখে আসবেন। তারপর এখান হতে তাঁদের আস্তানা উঠবে।

কুমার সাহেব এবং বনবিহারীদের দেখাতে হলে রাণীগঞ্জে বাড়ি তৈরী করে গাড়ি কিনে বড়লোকের মত বাস করা ছাড়া উপায় নেই।

॥ নয় ॥

বিজনবাবু নিজে সেদিন সকালে স্নুরেশকে ডেকে বললেন—ড্রাইভারকে ডেকে আন ত স্নুরেশ। বোলো গাড়িটা যেন একবার নিয়ে আসে। আমি রাণীগঞ্জে যাব।

স্নুরেশ খানিক পরেই ফিরে এল। বললে—ড্রাইভার এলো না বাবু।

—কেন ?

—বলল বাবুদের হুকুম নেই। গাড়ি আর ওকে দেওয়া হবে না।

মিতালী কাছেই বসেছিল। উভয়ে উভয়ের মুখের পানে একবার তাকাল।

বিজনবাবু স্নুরেশের দিকে তাকিয়ে বললে—আচ্ছা যা।

স্নুরেশ চলে গেলে বিজনবাবু বললেন—দেখেছ মজা।

মিতালী বললে—এ সেই তোমার মামাবাবুর কাজ। বনবিহারীবাবু এত ছোটলোক নন বলেই ত সেদিন আমার মনে হলো।

বিজনবাবু গুম হয়ে মাথা হেঁট করে বসে রইলেন।

মিতালী বললে—বসে বসে ভাবছ কি ? চল আজই আমরা এখান থেকে হেঁটে হেঁটে ষ্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরি। ট্রেনে চড়ে কলকাতা যাই। তারপর সেখানে নতুন একখানা গাড়ি কিনে সেই গাড়ি চড়েই এখানে আসি।

ভারি ত ভাঙ্গা ফুটো একখানা গাড়ি, তার আবার বড়াই করছেন—ছোটলোক কোথাকার।

বিজনবাবু এখনও তেমনি নতমুখে নীরবে কি যেন ভাবছিলেন।

মিতালী জিজ্ঞাসা করলে—কি ভাবছ ? আমি যা বললাম তাই করি চল।

বিজনবাবু ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়লে। বললেন—না ছেলেমানুষী আমি করব না। দাঁড়াও শত্রুতা করতে হয় ত ভাল করেই করি।

—কেমন করে করবে?

—স্বচক্ষে সব দেখতেই পাবে। সব তোমায় দেখিয়ে দিচ্ছি ছাখো। বলে বিজনবাবু উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—ভেবেছিলাম কিছু করব না। কিন্তু না, এ অপমানের প্রতিশোধ আমি নেবো।

এই বলে তিনি পিঞ্জর াবদ্ধ বাঘের মত সেইখানেই পায়চারী করতে লাগলেন।

মিতালীরাণী জিদ ধরল এখান হতে যাবার জন্যে একবার যখন মোটর গাড়িখানা তারা দেয়নি—তখন.নতুন মোটর একখানা আনতেই হবে।

বিজনবাবু বললেন—সেটা কি ভাল হবে? ওদের জব্দ করবার আরও অনেক অস্ত্র আমার হাতে আছে।

মিতালী বললে—সে সব অস্ত্র পরে তুমি চালিয়ো। এখন নতুন একখানা মোটর আমার চাই।

বিজনবাবু চুপ করে কি যেন ভাবছিলেন।

মিতালী বললে—তাহলে কি বলতে চাও এখান থেকে হেঁটে হেঁটে ষ্টেশনে গিয়ে আমি ট্রেণ ধরব? না—গরুর গাড়িতে চড়ে যেতে হবে?

কথাটা সত্য। বিজনবাবু বললেন—তাহলে আজই আমায় কোলকাতায় যেতে হয়। কিন্তু তোমায় এখানে একা রেখে যাওয়া কি উচিত হবে?

মিতালী বললে—তা হোক্। আমি একাই থাকব! এবার আমি আর তাদের এখানে ঢুকতে দেবো না।

রতনপুর ষ্টেশন অবশ্য বেশী দূরে নয়। বিজনবাবু যা কখনও করেননি সেদিন তাই করলেন। ছাতি মাথায় দিয়ে মুখ লুকিয়ে কোনরকমে তিনি হেঁটেই ষ্টেশনে গিয়ে ট্রেণ ধরলেন।

পরদিন তাঁর ফিরবার কথা। মিতালী সাগ্রহে পথ চেয়ে বসে-ছিল। কিন্তু সারাটা দিন পার হয়ে গেল, বিজনবাবু এলেন না।

সন্ধ্যায় বারান্দায় বসে বসে মিতালী সেদিনকার খবরের কাগজখানা পড়ছিল এমন সময় হাত জোড় করে সুরেশ তার কাছে এসে দাঁড়াল।

বললে—মা!

মুখ তুলে মিতালী বললে— কি?

সুরেশ বললে—ও বাড়ির মা ঠাকরুণ একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

—ও বাড়ির মা ঠাকরুণ কে?

জমিদার বাড়ির দিকে আঙুল বাড়িয়ে সুরেশ বললে—আমাদের বড়বাবুর মা।

মিতালী বুঝল। কিন্তু কেন যে তিনি এতদিন পরে হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন তার অর্থটা ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম করতে পারল না।

খানিক চুপ করে থেকে কি ভেবে সে জবাব দিল—না বাবা ওঁদের ও-বাড়ির মধ্যে যেতে আমি পারব না।

সুরেশ বললে—না মা, আপনাকে যেতে হবে না। উনি নিজে এসেছেন এখানে। দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন নীচে।

মিতালী তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল। বললে—নীচে দাঁড়িয়ে আছেন! সঙ্গে করে নিয়ে এলে না কেন সুরেশ? যাও—নিয়ে এসো!

কথাটা বলেই তার মনে পড়ল, সুরেশের দোষ নেই, এ বাড়িতে কেউ যেন প্রবেশ না করে সে হুকুম সে নিজেই দিয়েছে।

সুরেশ তৎক্ষণাৎ নীচে গিয়ে জমিদার গৃহিণীকে সঙ্গে নিয়ে ওপরে উঠে এসেছে। কিন্তু একটি দিনের জন্যও তাঁকে সে চোখে দেখেনি।

দেখল—হ্যাঁ, জমিদার গৃহিণী বটে। সাদা ধপ্‌ধপে গায়ের রং।

চমৎকার মুখ-শ্রী। সাদা একখানি থান কাপড় পরে ঝিকে সঙ্গে নিয়ে তিনি নিজেই এসেছেন।

নিরাভরণা বিধবার বেশ। গলায় একগাছি সরু সোনার হার।

তাঁরাও ব্রাহ্মণ। মিতালী হেঁট হয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে তাঁকে একটি প্রণাম করতেই হাঁ হাঁ করে তিনি দু'হাত দিয়ে তাকে তুলে নিলেন।

বললেন—থাক্ মা থাক্, আর প্রণাম করতে হবে না। বোসো তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

মিতালী তাঁকে একেবারে ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে বসাল। বললে—নীচে আপনাকে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে, কিছু মনে করবেন না। আমিই বারণ করে দিয়েছিলাম কেউ যেন না আসে।

—সেদিনও উনি বাড়ি ছিলেন না আপনার ভাই নিজে এসে আমায় যথেষ্ট অপমান করে গিয়েছিলেন তাই আমি এবার—

কথাটা বড় গিন্নী তাকে শেষ করতে দিলেন না। বললেন—সবই শুনলাম মা। শুনেই আমি এসেছি এখানে। এসেছি কেন বুঝতে পেরেছ ?

মিতালী দাঁড়িয়েছিল। তেমনি দাঁড়িয়ে থেকেই হেঁট মুখে ঘাড় নেড়ে বললে—না।

গিন্নী বললেন—এসেছি তাদের হয়ে ক্ষমা চাইতে।

এই বলে মিতালীর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে তিনি আবার বললেন—বোসো মা, তুমি বোসো। দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? তোমাকে তুমি তুমি করছি, কিছু মনে করছ না ত ? বয়সে তুমি আমার চেয়ে অনেক ছোট। আমার মেয়ের বয়সী।

মিতালী বললে—নিশ্চয়ই তুমি বলবেন। না বললেই আমি বরং দুঃখিত হব।

গিন্নী বললেন—হ্যাঁ, তারপর শোনো। ম্যানেজারবাবু কোথায় গেছেন? আসবেন কখন?

মিতালী বললে—আজই ত আসবার কথা ছিল, কেন যে এখনও এলেন না তাই ভাবছি।

—কোথায় গেছেন?

মিতালী গাড়ির কথাটা ওই অবসরে না বলে কিছুতেই থাকতে পারলে না। বললে—এখান থেকে চলে যাবার জন্য আমরা একবার আপনাদের মোটর গাড়িখানি চেয়েছিলাম, কিন্তু গাড়ি আপনারা দেন নি। পায়ে হেঁটে ত আর ষ্টেশনে যেতে পারি না, তাই উনি বোধ হয় একখানা গাড়ির ব্যবস্থাই করতে গেছেন।

গিন্নী বোধ করি লজ্জায় মাথা হেঁট করলেন। বললেন—ছি, ছি, ছেলেমানুষ কিনা, এতটুকু বুদ্ধি নেই মা! আর আমার ওই ভাইটির কথা ছেড়ে দাও। ওকে আমি আজ খুব করে ধমকে এসেছি।

এমন সময় নীচে একখানা মোটরের হর্নের শব্দ হতেই সুরেশ ছুটে এসে সংবাদ দিল—বাবু এসেছেন। একেবারে নতুন একখানা মস্তবড় হাওয়া গাড়ি নিয়ে এসেছেন মা!

মিতালী বললে—হ্যাঁ, নতুন মোটর কিনতেই আমি ওঁকে পাঠিয়েছিলাম।

গিন্নী অবাক হয়ে বললেন—আমাদের ওপর রাগ করে উনি কি নতুন মোটর কিনে আনলেন?

মিতালী মাথা নেড়ে বললে—হ্যাঁ।

গিন্নী একটু হেসে বললেন—কিন্তু মাইনে ত ওঁর মোটে দেড়শ' টাকা! তাই থেকে মোটর কেনবার মত পয়সা ওঁর হলো কেমন করে?

মিতালী বললে—পয়সা ওঁর নয়, পয়সা আমার।

কথাটা শুনেই গিন্নী কেমন যেন সন্দেহজনক দৃষ্টিতে মিতালীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কি যেন তিনি বলতেও যাচ্ছিলেন কিন্তু সিঁড়িতে বোধ করি বিজনবাবুর পায়ের শব্দ পাওয়া গেল।

বিজনবাবু তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে এসে মিতালীকে বোধ করি নতুন গাড়িখানার কথাই বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার কাছে অন্য দু'জন স্ত্রীলোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হঠাৎ তিনি থমকে গেলেন। শুধু বললেন—কে?

মিতালী কাছে এসে বললে—ও-বাড়ির গিন্নী।

বিজনবাবু বললেন—বৌ-ঠাকরুণ? হঠাৎ কি মনে করে? এখানে আসবার ত আপনার কথা নয়।

কথাটা বড় গিন্নী বুঝলেন। বুঝেও একটুখানি এগিয়ে এসে মাথার ঘোমটাটা একটু তুলে বললেন—আসবার কথা নয় তবু এসেছি। বুঝতেই পারছেন বিশেষ প্রয়োজন আছে।

বিজনবাবু বললেন—কিন্তু আমার সঙ্গে আপনাদের সব প্রয়োজনই তো চুকে গেছে। আজ আর আমার কি প্রয়োজন থাকতে পারে শুনি?

—বলছি। বসুন।

—এইমাত্র এলেন একটুখানি বিশ্রাম করবেন না?

বিজনবাবু হাসলেন।

বললেন—বিশ্রাম করতে আপনারা আর দিলেন কই? বুড়ো বয়সে ভেবেছিলাম এখান থেকে আর কোথাও যাব না। কিন্তু আপনার ভাই-জীবনের ইচ্ছে তা নয়।

এই বলে তিনি নিতান্ত ব্যস্তভাবে ইতস্ততঃ পায়চারী করতে করতে বললেন—নিন চলুন, আমায় আবার যাবার ব্যবস্থা করতে হ'বে।

—ওরে, ও সুরেশ! কলকাতা থেকে গাড়ির সঙ্গে যে নতুন ড্রাইভার এসেছে ওকে খাইয়ে দিতে হবে বাবা। খাইয়ে নীচের ঘরেই ওর শোবার জায়গা করে দিবি।

—যে আজ্ঞে! বলে সুরেশ কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল—তামাক দেবো?

বিজনবাবু বললেন—দে।

সুরেশ চলে যেতেই বিজনবাবু আবার একবার বড়গিন্নীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—আপনি বসুন দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

গিন্নী বললেন—বসছি। আপনি যান—জামা কাপড় ছেড়ে মুখ হাত ধুয়ে আসুন। আমার যা বলবার, যে কথা বলতে আমি এসেছি আপনার কাছে, সে কথা না বলে আমি যাব না।

—বলতেই তো বলছি আপনাকে। বলুন।

গিন্নী মাথা নেড়ে বললেন—না, এ রকমভাবে বলব না আমি কিছুতেই। আপনি জামা কাপড় ছেড়ে আসুন। আমি ততক্ষণ গল্প করি।

এই বলে চোখের ইসারায় মিতালীকে কাছে ডেকে তিনি সেখান থেকে সরে গেলেন।

বিজনবাবু শেষ পর্যন্ত জামা কাপড় ছাড়বার জন্য ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

জামা কাপড় ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে ফিরে আসতে তাঁর বেশী দেরী হলো না।

ঘরের ভেতর সুরেশ গড়গড়াটা ধরে দিয়ে গেল।

বললে—চা আনব?

—নিয়ে এসো। কিন্তু হ্যাঁ আপনি আজ এ গরীবের এখানে এসেছেন—বলতেও ভয় করে—কিঞ্চিৎ জলযোগ—

মিতালী বলল—অনেকক্ষণ থেকেই বলছি, কিন্তু তোমার এখানে উনি জলযোগ করবেন না।

গিন্নী তার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। বললেন—দুঃখ যদি তোর সত্যিই হয় ত যা মা, আন তোর যা খুসী আমি খেয়ে যাই।

মিতালী সত্যিই অত্যন্ত খুসী হয়ে ঘর হতে একবার বের হয়ে গেল এবং কয়েক মিনিট পরেই হাসতে হাসতে আবার ফিরে এল। বোঝা গেল, রান্না ঘরে গিয়ে ঠাকুরকে বোধ করি উপদেশ দিয়ে এল।

বিজনবাবু বললেন—এবার বলুন, আপনি কি বলবেন ? শোনবার জন্য আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছি।

কথাটা বলতে বড়গিন্নীর বোধকরি কষ্ট হচ্ছিল। তাই বার কতক এদিক ওদিক চেয়ে, বার কতক ঢোঁক গিলে কাছে এসে বললেন—আমার ছেলেদের দোষ আপনি ক্ষমা করুন—আপনি তাদের বাপের বয়েসী, তাদের দোষ আপনি নেবেন না।

বিজনবাবু বললেন—কি সর্বনাশ! না না, দোষ আমি তাদের নিইনি!
এ ত বেশ ভালই হয়েছে, নিজেদের এষ্টেট দেখা শোনা করবে এত স্থখের বিষয়! এতে ত আমার দুঃখিত হবার কিছু নেই।

বড় গিন্নী বললেন—আছে বইকি। আপনার দুঃখিত হবার কারণ যথেষ্টই ঘটেছে। ছেলেরা কি করেছে না করেছে সব শুনেই আমি এলাম আপনার কাছে। আমার এষ্টেট ছেড়ে যেতে আপনি পারবেন না—এই অনুরোধ।

এ-রকম অনুরোধ যে তিনি করবেন বিজনবাবু এতটা ভাবতে পারেননি। বললেন—আজ্ঞে না, আমায় মাপ করুন। যাবার সব বন্দোবস্তই আমি করে ফেলেছি। সবই যখন আপনি শুনেছেন তখন এ অনুরোধ আপনি আমায় কেমন করে করছেন বলুন ত ?

—কেন করছি, কেন আমি আপনার কাছে ছুটে এসেছি সে কথা কি আপনি বুঝতে পারছেন না বিজনবাবু ?

বলতে বলতে কণ্ঠস্বর তাঁর ভারি হয়ে এল, চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্‌ করে জল পড়তে লাগলো।

বিজনবাবু বহুদিনের পুরোনো লোক।

এই রতনপুর ষ্টেট্‌ এবং এর প্রত্যেকটি প্রাণীর ওপর তাঁর যে মমতার বন্ধন এখনও শিথিল হয়নি। এতক্ষণ পরে তিনি যেন তা মনে মনে অনুভব করতে লাগলেন।

বললেন—সত্য বলছি বৌ-ঠাকরুণ আমি আপনার ছেলেদের কাছ থেকে এ ব্যবহার কখনও আশা করতে পারিনি। কি অপবাদ দিয়ে আমায় এখান থেকে তাড়ানো হচ্ছে শুনেছেন ত ?

বড় গিন্নী হেঁট মুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

বিজনবাবাবু বললেন—অশ্চরিত্র। আমি অযোগ্য।

এই বলে মিতালীর দিকে আঙুল বাড়িয়ে তিনি বললেন—এই বাড়িতে এসে আপনার ভাই ওঁকে অপমান করে গেছে। আমি বাড়িতে ছিলাম না। সেই সুযোগে একজন ভদ্রমহিলাকে মুখের ওপর এমন সব কথা তিনি বলে গেছেন। যাক সে সব আর আমি বলতে চাই না বৌ-ঠাকরুণ, আপনার স্বামীর অনেক নিমক আমি খেয়েছি, ভালই হয়েছে, আমায় ছুটি দিন, আমি চলে যাই।

বৌ-ঠাকরুণ বললেন—আপনি চলে যদি যান কয়েকটা বছরের মধ্যেই দেখবেন, রতনপুর এষ্টেটের আর কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই। ছেলেরা দু'বেলা খেতে পরতে পাবে না এ আমি সচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। তাই আপনাকে আমার অনুরোধ, আমি যতদিন বেঁচে আছি। অন্ততঃ ততদিন আপনি থাকুন।

বিজনবাবু বললেন—না, না, অতখানা ভাববেন না আপনি বৌ-ঠাকরুণ—বনবিহারী ভাল ছেলে—সবই সে বোঝে—আর তাছাড়া আপনার রতনপুরের জমিদারীতে এখনও যা আছে, ওরা সবাই মিলে দু'হাতে যদি ওড়াতে আরম্ভ করে তাহলেও ওদের জীবনে উড়বে না। কিছু সময় লাগবে।

বৌ-ঠাকরুণ বললেন—সে যাই হোক, যেতে আপনি পাবেন না।

বিজনবাবু এইবার একটুখানি শক্ত হলেন। বললেন—তা এতই

যদি দরদ ত এতদিন কোথায় ছিলেন? আপনার ছেলেকে আমি যাবতীয় চার্জ বুঝিয়ে দিলাম, আমার মাইনে সে চুকিয়ে দিল, এখান থেকে যাবার জন্যে আপনাদের গাড়িখানা একবার চেয়ে পাঠালাম, অপমান করে আপনার ভাই বললে—গাড়ি তাকে দেওয়া হবে না। এ সব কাণ্ড যখন ঘটলো তখন কোথায় ছিলেন আপনি? শুনলাম আপনিও ত মত দিয়েছিলেন। আজ হঠাৎ আপনার সে মত বদলালো কেন বলুন ত?

বৌ-ঠাকরুণ বললেন—আপনি বিশ্বাস করুন বিজনবাবু—এ সব ব্যাপার অনেকখানিই আমি জানি না। তা সত্যি কথা বলতে কি ছেলের অনুরোধে আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও একবার মত দিয়েছিলাম; তারপর—তারপর—

বলতে বলতে হঠাৎ কি যে তাঁর হলো কে জানে মাথায় হাত দিয়ে সেইখানেই তিনি বসে পড়লেন। মিতালী ছুটে এল, ঝি এল।

বৌ-ঠাকরুণ অস্পষ্ট কণ্ঠে বললেন—মাথাটা ঘুরছে।

বলতে গিয়ে তিনি শুয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগলেন। সকলে সবিস্ময়ে দেখল, তিনি মূর্ছিতা হয়ে পড়লেন।

॥ দশ ॥

বৌ-ঠাকরুণের মূর্চ্ছা যখন ভাঙ্গল তখন সেখানে বনবিহারী কুমার-সাহেব ইত্যাদি সকলেই এসে জুটেছে।

বৌ-ঠাকরুণের মূর্চ্ছা দেখে বিজনবাবু ভয় পেয়েই তাদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তারা কিন্তু এসেই হুলুস্থুলু কাণ্ড বাধিয়ে তুলল। মূর্চ্ছা ভাঙ্গলে কুমার সাহেব বলতে লাগল—তোমার চাল চলন বড় খারাপ দিদি, তুমি যাই বল।

বৌ-ঠাকরুণ বললেন—চুপ কর দেখি। আমায় একটুখানি সামলাতে দে।

কুমার সাহেব বললে—চুপ না হয় আমি করছি কিন্তু তোমায় এখানে আসতে কে বললে? বিজনবাবুকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তা কি তুমি জানো না?

বৌ-ঠাকরুণ বললেন—জানি। জানি বলেই এসেছি। ভেবে দেখলাম—ভারি অন্যায় হচ্ছে। বিজনবাবু না থাকলে তোর ভাগ্নেয়া যে শেষ পর্যন্ত খেতে পাবে না—তা আমি স্বচক্ষে দেখতে পেলাম। তাই এসেছিলাম তাঁকে থাকবার জন্যে আবার অনুরোধ করতে।

কুমার সাহেব বললে—তোমার অনুরোধ তিনি রেখেছেন?

—কেমন করে রাখবেন? তোরা তাঁর অপমানের কিছু কি বাকি রেখেছিস? তুই নিজে এসে তাঁর স্ত্রীকে অপমান করে গেছিস। চিঠি লিখে তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রীকে এখানে আনিয়েছিলি—অনর্থক ওদের দুজনের মধ্যে একটা ঝগড়া বাধিয়ে দেবার জন্যে।

মোটর চাইতে গেলে দিসনি। এর চেয়ে বেশী অপমান ওঁর মত ভদ্রলোকের আর কি হতে পারে?

কুমার সাহেব চুপ করে রইল।

বৌ-ঠাকরুণ আবার বললেন—চুপ করে রইলি যে! জবাব দে। আমি ত লুকিয়ে ছাপিয়ে কিছু বলিনি, বলছি সকলের কাছেই। ওঁর কি ক্ষতিটা করতে পারলি তোরা শুনি? উনি তোদের দেখিয়ে দেখিয়ে নতুন মোটর নিয়ে এলেন।

আরও কি যেন তিনি বলতে যচ্ছিলেন কিন্তু কুমার-সাহেব হো হো করে হেসেই তাঁকে চুপ করিয়ে দিলে।

হাসি থামলে বলল—নতুন মোটর উনি আনলেন কার পয়সায় সেই কথাই বলছ ত? তা আমরা জানি। জানি বলেই ত ওঁকে ছাড়িয়ে দিলাম। কারণ এক দেড়শ টাকা মাইনের কর্মচারীর যখন মোটর কেনবার সামর্থ্য হয় তখন তাকে আর রাখতে নেই।

বিজনবাবু পাশে তার একটা ঘরের ভেতর থেকে সবই শুনছিলেন। এবারের কথাগুলো সত্যিই তাঁর অসহ্য হয়ে উঠল।

ধীরে ধীরে বাইরে এসে বললেন—তোমার ভগ্নীপতির নিমক আমি অনেক খেয়েছি অস্বীকার করব না। কিন্তু শোনো তাঁর পয়সায় মোটর আমি কিনিনি, মোটর কিনেছি আমার স্ত্রীর পয়সায়। ওই যে—যিনি ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন—যাঁকে একদিন অপমান করতে এসেছিলে—ওঁর জমিদারীতে তোমার মত দরোয়ান চার পাঁচজন আছে। তুমি যদি সেখানে একটা চাকরী চাও ত দরখাস্ত করো, আমি সুপারিশ করে দেবো। এখন যাও দেখি এখান থেকে। কাল সকালে যখন আমরা এ বাড়ি ছেড়ে দেবো তখন এসো।

তারপর সুরেশকে ডেকে বললেন—এই লোকটাকে এখান থেকে বিদেয় করে দে সুরেশ।

এই বলে তিনি এক রকম জোর করেই তাকে বাড়ি হতে বের করে দিতে চাইলেন।

বৌ-ঠাকরুণের কাছে এসে বললেন—আপনি কিছু মনে করবেন

না বৌ-ঠাকরুণ। আপনাকে আমি বলিনি। আপনার অনুরোধ রাখতে পারলাম না বলে সত্যিই দুঃখিত হলাম। ওদের নিয়ে আপনি এবার এখান থেকে উঠুন।

বৌ-ঠাকরুণ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—এর পর আর আমি আপনাকে থাকবার জন্যে অনুরোধ করতে পারি না বিজনবাবু। ছেলেদের ভালো আমি চেয়েছিলাম বলেই এসেছিলাম আপনার কাছে। তা যখন হলো না তখন চললাম।

এই বলে তিনি একবার তাঁর পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন —আমিও আর তোদের সংসারে থাকব না বাবা, আমায় তোরা কাশী পাঠিয়ে দে, সেইখানেই জীবনের বাকী কটা দিন কাটিয়ে দিই গে।

বনবিহারী বলল—তা বেশ, তোমার কাশী যাবার ব্যবস্থা আমি করে দেবো। এখন বাড়ি চল।

পরদিন প্রভাতেই বিজনবাবু রতনপুর পরিত্যাগ করলেন।

কাছাকাছি সহরেই একটা বাড়ি তিনি আগেই ভাড়া করে এসেছিলেন।

দেখতে দেখতে আসবাবপত্রে তাঁর সে বাড়িও ভরে উঠল।

মিতালী জিজ্ঞাসা করল—ওদের যে জব্দ করবে বলেছিলে তার কি হলো?

বিজনবাবু হাসলেন।

বললেন—ছাখো না, কি করি। তুমি শুধু বসে বসে দেখে যাও।

মিতালী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল—আচ্ছা তাই দেখি।

মিতালীরাণীকে নিয়ে রাণীগঞ্জ শহরের একপ্রান্তে বিজনবাবু বাসা বেঁধেছেন।

রতনপুর হতে দাসদাসী সকলেই তাঁর সঙ্গে এসেছে।

সুখ-শান্তি, অর্থ-ঐশ্বর্যের অভাব নেই। তাই বলে বিজনবাবু যে চুপ করে বসে আছেন তা নয়। আরও ঐশ্বর্য তিনি বাড়াতে চান।

রতনপুর হতে আসার সময় সে ব্যবস্থা তিনি করেই এসেছিলেন। এখানে এসে তার ফলভোগ করতে লাগলেন।

রতনপুরের ছোট ছোট জমিদারিগুলি ধীরে ধীরে তার হাতে আসতে আরম্ভ করল।

মিতালীকে কাছে ডেকে বললেন—তিনটি ত নিলাম। এই আরও গোটাকতক আয়ের জায়গা নিতে পারলেই ব্যস্—রতনপুর এষ্টেট ফোঁপরা হয়ে যাবে।

মিতালী হেসে বললে—এসব ব্যবস্থা তুমি কখন করেছিলে কই কিছুই ত জানি না ?

বিজনবাবু বললেন—অনেকদিন থেকেই করে রেখেছিলাম। আমারই হাতে সব অথচ আমাকেই তাড়াবার জন্যে অপমান করতে ব্যস্ত।

রাজার রাজস্ব বন্ধ করেছিলাম, জানতাম একদিন নীলাম উঠবেই। আমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার যদি না করতো, তাহলে ওদের জিনিষ ওদেরই থাকতো তোমার নামে এমন করে ডেকে নিতাম না।

মিতালী বললে—তা বেশ করেছ। এবার ভবিষ্যতে যদি কোনদিন এখানে ওরা আসে, ওই কুমার সাহেব আমার পায়ে ধরে ক্ষমা চায় ত তখন না হয় ফিরিয়ে দেবো।

বিজনবাবু বললেন—সে তোমার খুসী।

॥ এগারো ॥

শহরে এরই মধ্যে সকলে জেনেছে যে রতনপুর এষ্টেটের ম্যানেজার বিজনবাবু সস্ত্রীক এখানে এসে বাস করছেন। বৈকালে যখন তাঁরা নতুন মোটরে চড়ে বেড়াতে বের হন, রাস্তার দুধারে লোকজন হাঁ করে তাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

শহরটা খুব বড় শহর নয় কারবারী লোকের সংখ্যাই বেশী। ধনী দু'চার জন আছে বটে, কিন্তু এমন চমৎকার মোটর গাড়ি কারও নেই।

মিতালী বলল—এখানেই যখন থাকা আমাদের ঠিক হলো তখন বাড়ি একখানা করতে হবে।

বিজনবাবু হেসে জবাব দিলেন—জায়গা আমি কিনেছি গো রাণী! ভেবেছিলেম একেবারে তৈরী করে তোমায় একটুখানি অবাক করে দেবো। কিন্তু তা আর হলো না দেখছি।

বাড়ি তৈরী করতে বেশী সময় লাগল না।

শহরের বড় রাস্তার ধারে,চমৎকার একখানা বাড়ি উঠল।

বিজনবাবু তার নাম দিলেন মিতালী কুটির।

মিতালী প্রতিবাদ করল—না, আমার নাম তুমি দিতে পাবে না।

—কেন ?

—আমার নাম ভারি খারাপ।

বিজনবাবু হেসে বললেন—তোমার নাম তোমার কাছে খারাপ লাগতে পারে কিন্তু আমার কাছে ভালই লাগে।

মিতালী কিন্তু কোন কথাই শুনল না।

বললে—কিছুতেই তুমি ও-নাম দিতে পারবে না। আর বাঁড়ির নাম নাই বা দিলে।

বিজনবাবু বললেন—তাহলে বাড়ির নাম দিলাম—রাণী-কুটির। বাড়ির নাম একটা দেওয়া উচিত।

এমন সুন্দর বাড়ি হলো, শহরের লোক সব দেখতে আসছে এর একটা নাম থাকবে না ?

মিতালী বলল—তাহলে এক কাজ কর লতার ছেলে খোকনের ভাল নাম কি এখনও কিছু রাখা হয়নি ? ওরই নামে বাড়ির নাম হোক।

এ প্রস্তাব মন্দ নয়। বিজনবাবুও রাজি হলেন।

বললেন—কিন্তু তার নাম যে এখনও রাখা হয়নি গো। শোন শোন তার চেয়ে বাড়ির নাম দিলাম—লতা-কুটির। মেয়েটার নামের স্মৃতিটা অন্তত থাক্।

মিতালী বললে—হ্যাঁ, এতক্ষণে ঠিক হয়েছে। মার্বেল পাথরের ওপর নামটা লিখবে কে ? কোলকাতা থেকে লিখিয়ে আনতে হবে নাকি ?

বিজনবাবু বললেন—না। বাড়িতে মার্বেলের কাজ যারা করছে তারাই লিখে দেবে।

তাই হল।

বিজনবাবুর একমাত্র যে কন্যাটি অকালে মরে গেছে, শেষ পর্যন্ত তারই নাম অনুসারে বাড়িখানির নামকরণ হলো—লতা-কুটির।

কিন্তু এ ব্যাপারে আনন্দ হত যারা সবচেয়ে বেশী সে কামিনীই এর বিন্দু-বিসর্গও জানলেন না ; এবং তার ছেলেটিকে নিয়ে কোথায় কোন এক অখ্যাত পল্লী প্রান্তে একাকিনী যেমন তিনি ছিলেন তেমনি পড়ে রইলেন।

কিন্তু বিজনবাবুর যখন এমনি সুখের অবস্থা, ঠিক সেই সময় সুখচরের কে যেন একটা লোক গঞ্জ থেকে ফিরে এসে কামিনীর কাছে সংবাদ দিলে যে সে নাকি তাঁর স্বামীকে মোটরে চড়ে বাজারের পথে

ঘুরতে দেখে এসেছে এবং সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা, বাবুকে একলা দেখে নাই, সঙ্গে দেখেছে একটি মেয়েকে।

কামিনী বলেন—হ্যাঁ, জানি। মেয়েটি ওঁর এক বন্ধুর মেয়ে আবার এক বন্ধুর স্ত্রী। বেচারী ভারী বিপদে পড়ে ওঁর আশ্রয় নিয়েছে।

লোকটা ঘাড় নেড়ে বললে—কিন্তু না, আমি যেন শুনে এলাম অন্য রকম।

—কি রকম শুনি।

—বাজারের সব লোক বলে উনি ওর বিয়ে করা স্ত্রী। আমিই বরং সেখানে তোমার কথা বলতে গিয়ে বোকা বনে গেলাম।

কামিনী কিছুতেই বিশ্বাস করলে না।

বললেন—লোকের কথায় কান দিতে নেই বুঝলে? কত লোক কত কথা বলে। অমনি একটা দুষ্ট লোক আমাকে একদিন একটা চিঠি লিখেছিল। আমি নিজে গিয়ে মেয়েটিকে দেখে এসেছি।

মেয়েটিকে যে কামিনীও স্বচক্ষে দেখেছেন লোকটা তা জানত না।

কাজেই সে চুপ করে রইল।

কিন্তু দিন কয়েক পরে আবার।

আবার আর একটি মজার সংবাদ।

এবার লোকজন সব বলাবলি করতে লাগল, বিজনবাবু গঞ্জে একটি চমৎকার বাড়ি তৈরী করেছেন এবং সে বাড়ির নাম হয়েছে—'লতা-কুটির'।

সংবাদটা শুনে কামিনীর দুচোখ জলে ভরে এল। জবাবে এবার আর তিনি একটি কথাও বলতে পারলেন না।

লতা কুটির।

স্বামী তাঁর কন্যার নাম অনুসারে বাড়ির নাম রেখেছেন।

রাখবেনই ত। এত আদরের মেয়ে তাঁর এত অল্প বয়সে মরে গেল, তার নাম অনুসারে বাড়ির নাম রাখবে না ত কি!

লতার ছেলেটিকে বুকের ওপর চেপে ধরে কামিনী কাঁদতে থাকেন; আর পাড়া-পড়শী মেয়েদের শুনিয়ে বেড়ান—আজ যদি আমার মেয়ে বেঁচে থাকতো, তার কি আনন্দই না হত।

মেয়েরা বলে—তা হ্যাঁগা, বাবু লতা কুটির করলে কিন্তু তোমাকে একবার দেখার জন্যে ত কই নিয়ে গেল না?

কামিনী বললে—নিয়ে যায়নি কি সাধে! নিয়ে যায়নি আমারই জন্যে। আমি ত সেই বাড়ি দেখে কেঁদেই ভাসাব আর ওঁর কাছে চব্বিশ ঘণ্টা কত সাহেব সুবো কত বড় বড় রাজা-মহারাজা আসেস। তাদের কাছে বাবুর লজ্জা হবে কিনা। তাই এতদিন নিয়ে যাননি।

তবে যাব একবার, হ্যা, যাব বই-কি নিশ্চয়ই যাব।

এই বলে সে আলোচনাটা তখনকার মত বন্ধ করে দিয়ে কামিনী রাণীগঞ্জে একবার যাবে কি-না সেই কথাটাই ভাবতে থাকেন।

যে স্বামীর চাকরী গিয়েছে শুনে তিনি তুলসীতলায় বারংবার মাথা ঠুকেছেন, সেই স্বামীই তাঁর নতুন বাড়ি করেছে নতুন গাড়ি কিনেছেন।

সত্যিই আনন্দের কথা! আর যদি তাই হয় ত এখানে এই পল্লী-গ্রামে তিনি আর পড়ে থাকেন কেন, এবার ত তিনি গঞ্জের সেই 'লতা কুটিরে' গিয়ে স্বামীর সঙ্গে বাস করতেও পারেন।

কামিনী একবার ভাবলেন আগে একটা লোক পাঠিয়ে স্বামীকে খবর দিয়ে যাওয়াই ভাল। তা হলে তিনি নতুন মোটরখানা পাঠিয়ে দিতেও পারেন।

আবার ভাবলেন কাজ নেই খবর দিয়ে। এখন আসতে হবে না বলে যদি বারণ করে বসেন!

তার চেয়ে পরেশকে সঙ্গে নিয়ে ট্রেণে চড়ে গঞ্জে গেলে মন্দ হয়

না। সেবারকার মত রতনপুর থেকে গিয়েই যেমন ফিরে এসেছিলেন এবারও না হয় তেমনি ফিরেই আসবেন।

এই ভেবে একদিন তিনি সত্যিসত্যিই পরেশকে সঙ্গে নিয়ে 'লতা কুটিরে' গিয়ে উপস্থিত হলেন।

বিজনবাবু কোথায় যেন গিয়েছিলেন।

মিতালীর সঙ্গেই তাঁর প্রথম দেখা।

মিতালী তাঁকে একটি প্রণাম করে বলল—আসুন।

লতার ছেলেটি ছিল কামিনীর কোলে। ছেলেটি আগেকার চেয়ে দেখতে এখন বেশ সুন্দর হয়েছে।

মিতালী বলল—ওরই নামে বাড়ির নাম হবে উনি বলেছিলেন। ওর নামটি কি রেখেছেন দিদি ?

কামিনী বললেন—নাম ত এখনও কিছু রাখিনি ভাই। আমি ওকে খোকন বলেই ডাকি।

মিতালী বলল—উনিও ঠিক সেই কথাই বললেন। তখন আমি বললাম লতার নামেই হোক। উনি বাড়ির নাম দিলেন —'লতা-কুটির'।

কামিনী বললেন—সেই শুনেই এলাম।

এই বলে বাড়ির এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে চোখে তাঁর জল এলো। চোখের জল মুছে কামিনী বললেন—ছাখো বড় সাংঘাতিক একটা কথা রটেছে আমাদের গাঁয়ে।

মিতালীর মুখখানা হঠাৎ কেমন যেন হয়ে গেল। কথাটা যে কি কামিনী না বললেও সে যেন আন্দাজে খানিকটা বুঝতে পারল।

জিজ্ঞাসা করল—কি কথা দিদি।

কামিনী বললেন—সে ভাল কথা নয় ভাই, সে আর শুনে কাজ নেই। আমাদের গাঁয়ের লোক ত রোজই আসে গঞ্জে, তাদেরই কেউ কেউ হয়ত দেখে গেছে তোমাকে ওঁর সঙ্গে মোটর বেড়াতে।

তারাই গাঁয়ে গিয়ে রটিয়েছে, উনি নাকি তোমাকে আবার বিয়ে করেছেন। ছ্যাখো দেখি ভাই লোকের কথা! আমি ত ঝগড়া করে মরি।

মিতালীর বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। ভাবল—ছি ছি, উনি ভারি অন্যায় করেছেন। সেদিন স্পষ্ট সত্য কথাটা বলে দিলেই হত।

একদিন না একদিন উনি নিশ্চয়ই জানবেন। তখন কি হবে কে জানে।

মিতালী চুপ করে কি যেন ভাবতে লাগল।

কামিনী জিজ্ঞাসা করলেন—কি ভাবছো?

কটাটা শুনে মিতালী যেন চমকে উঠল।

বলল—না, কিছু ভাবিনি। ভাবছি—উনি সেই সকালে বেরিয়েছেন, এখনও ফিরলেন না কেন কে জানে।

মিতালীর ইচ্ছা করছিল সত্য কথাটা এখনই তাঁকে বলে ফেলে, কিন্তু বিজনবাবুকে একবার জিজ্ঞাসা না করে বলা উচিৎ নয় ভেবে চুপ করে রইল।

লতার ছেলেটিকে আদর করে খাইয়ে কামিনীর স্নানাহারের ব্যবস্থা করবার জন্যে মিতালী ব্যস্ত হয়ে উঠল।

কথাটা অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য চাপা পড়ল।

॥ বারো ॥

আহারাদির পর মিতালী ও কামিনী বসে বসে গল্প করছে এমন সময় বিজনবাবু এলেন।

কামিনীকে যে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে এখানে দেখতে পাবেন সে আশা তিনি করেননি।

তাই কেমন যেন একটু চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কখন এলে ?

জবাব দিল মিতালী।

বলল—দশটার সময়।

—বাড়ি থেকে ?

—তা ছাড়া আর কোত্থেকে আসবেন ?

—একাই এল ?

মিতালী মনে মনে হাসল।

স্বামীর অবস্থাটা সে বুঝতে পেরেছিল।

এমনি সব অবান্তর প্রশ্ন মানুষ কখন করে তা সে জানে।

বলল—একা নয় সঙ্গে গ্রামেরই একটি ছেলে এসেছে।

—ও! বলে আর কি বলবেন খুঁজে না পেয়ে বিজনবাবু বোকার মত দাঁড়িয়ে রইলেন।

মিতালী বললে—দাঁড়িয়ে রইলে কেন? একে সেই কোন্ সকালে বেরিয়ে বাড়ি ফিরলে এই এত বেলায়।

—যাও জামা কাপড় ছেড়ে চারটি খেয়ে নাও। বেলা কি আর আছে ?

বিজনবাবু যেন বেঁচে গেলেন।

তাড়াতাড়ি সেখান থেকে এক রকম পালিয়ে স্নানের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

খাবার সময় মিতালী সেদিন আর তাঁর কাছে গিয়ে বসল না।

বিজনবাবু শুয়ে শুয়ে গড়গড়ার নলটা মুখে দিয়ে অল্প অল্প টানছিলেন, মিতালী তাঁর কাছে এসে দাঁড়াল।

বিজনবাবু মুখ তুলে বললেন—সে কোথায়?

মিতালী বলল—ঘুম পাড়িয়ে এসেছি।

—বেশ করেছ, বোসো?

—না, বসব না। খেয়েছ ত? না—আমি কাছে বসলাম না বলে খাওয়াই হলো না?

বিজনবাবু সে কথার জবাব দিলেন না।

বললেন—কোথায় গিয়েছিলাম বল দেখি।

মিতালী একটু হেসে বলল—চুলোয়।

—না হাসি নয়। আজ আমি কিছু রোজগার করেছি।

—কত?

—বলই না কত হতে পারে? দেখি তোমার আন্দাজ।

—পাঁচ, দশ, পনেরো—আর কত?

বিজনবাবু বললেন—অনেক বেশী। দশ হাজার। একটা কয়লার জায়গা বন্দোবস্ত করে এলাম।

মিতালী হাসল।

বলল—তোমাকে আরও কিছুদিন ম্যানেজার তাহলে আমি রাখব।

বিজনবাবু বললেন—মাইনে কিছু বাড়িয়ে দিতে হবে।

—তা দেবো।

—কিন্তু হ্যাঁ, শোন, যে-জন্যে এসেছি সেই কথাটা বলি আগে।

এই বলে সামনের দরজাটা সে ভেজিয়ে দিয়ে এসে অতি সন্তর্পণে তাঁর শিয়রের কাছে বসল।

বলল—আজ এতদিন পরে আমার মনে হচ্ছে যেন আমি সত্যিই বৌ হয়েছি।

বিজনবাবু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন—কেন বলো ত বললে—এরকম হঠাৎ ?—কিছু জিজ্ঞাসা করেছ ?

মিতালী বলল—করেছি। লতার নামে বাড়ি করেছ, লোকের মুখে শুনে তাই দেখতে এসেছেন। আসবার আরও একটা কারণ আছে। কিন্তু সে কথাটা উনি সহজে বলতে চাচ্ছিলেন না।

—কি কথা গো ?

মিতালী বলল—তোমাদের গ্রামের কে একটা লোক তোমাকে আর আমাকে একসঙ্গে মোটরে চড়ে বেড়াতে দেখে গেছে। দেখে গিয়ে বলছে—তুমি নাকি আবার একটি বিয়ে করেছ। উনি তাই নিয়ে লোকের সঙ্গে ঝগড়া করেছেন।

বলেছেন—তাকে আমি দেখেছি, সে তার বন্ধুর বৌ।

বিজনবাবু চুপ করে রইলেন। মুখ দেখে মনে হলো কি যেন ভাবছেন।

মিতালী বলল—কিন্তু আর বাপু চুপ করে থাকা উচিত নয়। জানতে সে একদিন পারবেই। তার চেয়ে এখনই বলে দেওয়া উচিত।

বিজনবাবু বললেন—উচিত তা আমিও জানি। কিন্তু কান্নাকাটি কেলেঙ্কারী করে যদি ? যদি একটা বিশ্রী উপদ্রব আরম্ভ করে, তখন সামলাবে কে ?

মিতালী বলল—সে একটুখানি করবেই। হাজার হোক মেয়ে মানুষের মন। তারপর সতীন হয়েছে। নিজের ছেলেপুলে নেই। কী যে বল তুমি !

—না বাপু, আমার কিন্তু আর ভাল লাগছে না। আজ আমি বলে দেখি।

বিজনবাবু বললেন—আগে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাই তারপর বোলো।

মিতালী হাসতে লাগল।

হাসতে হাসতে বলল—এত ভয়?

বিজনবাবু বললেন—আমি ফিরব সেই রাতে। তুমি যেন সবদিক সামলে রেখো। কিন্তু আমার কি ভয় হচ্ছে জানো? আমার মনে হয় ওকথা শুনলে সে আর এখান থেকে যেতে চাইবে না।

বিজনবাবু তাড়াতাড়ি মোটরে চড়ে বেরিয়ে গেলেন।

মিতালী কামিনীর কাছে গিয়ে দেখল তিনি তখন উঠে বসেছেন।

ওদিকে ছেলেটা ঘরের মেঝেতে বসে খেলা করছে।

কামিনী জিজ্ঞাসা করলেন—কোথায় গিয়েছিলে?

মিতালী বলল—দেখতে গিয়েছিলাম উনি আছেন না বেরিয়ে গেছেন।

কামিনী জিজ্ঞাসা করলেন—বাড়ি ফিরতে রোজই কি এমনি দেরী হয় নাকি? এই এত বেলা করে রোজ খান?

মিতালী বলল—না। আজ উনি কি একটা কাজে যেন ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন। বেলা শুধু আজকেই হয়েছে, অন্যদিন হয় না।

কামিনী বললেন—তুমি কাছে রয়েছ ভাই দেখো। এত বেলা করে খেলে শরীর ভেঙ্গে যাবে।

এই বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

বললেন—চল দেখি একবার দুটো কথা কয়ে আসি।

মিতালী বলল—আবার যে বেরিয়ে গেলেন।

—আবার কোথায় গেলেন?

ফিরবে কখন?

—তা ত জানি না। আমার সঙ্গে দেখা হয়নি।

কামিনী খোকাকে কোলে নিয়ে বিজনবাবু যে ঘরে থাকেন সেই ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন, মিতালী তাঁর পিছু পিছু গেল।

ঘরখানি কামিনী আগেও একবার দেখেছেন। আবার একবার ঘরে ঢুকে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখতে লাগলেন।

স্বামীকে অনেকদিন তিনি দেখেননি, অনেকদিন তাঁর সঙ্গে ভাল করে কথা বলেননি।

ভেবেছিলেন, রতনপুরের বাবুদের বাড়ির চাকরিটি তাঁর গেছে, না জানি কত বিপদেই না পড়েছেন এবং এর জন্য ভগবানের কাছে দুবেলা তিনি মাথা ঠুকেছেন।

ভগবান তাঁর প্রার্থনা শুনেছেন।

কামিনী ভাবলেন—আসুন তিনি। এলে বলবেন—এত সুখ যখন তাঁর হয়েছে, তখন এখানে সে কিছুদিন থেকে যাবে।

গ্রামের বাড়িতে তালাচাবি বন্ধ করে দিয়ে একটা লোক রেখে দিলেই চলবে।

কিন্তু তাঁর বড় লজ্জা করে এখানে থাকতে।

স্বামীর কত বড় বড় লোকের সঙ্গে কারবার। কত সাহেব সুবোর সঙ্গে দিবারাত্রি তিনি দেখা করেন। বড় লোকের মেয়েরা হয়ত তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসবে। অথচ চিরদিন তিনি পল্লীগ্রামে বাস করেছেন, শহরের কায়দা-কানুন, আচার ব্যবহার কোন কিছুর সঙ্গে কোনও পরিচয় তাঁর নেই।

এত বড় একটা লোকের এমন অশিক্ষিতা একটা গোঁয়ো স্ত্রী বলে কেউ যদি উপহাস করে ত তাঁর লজ্জার আর অবধি থাকবে না।

লজ্জা অবশ্য তাঁর নিজের জন্য নয়, লজ্জা তাঁর স্বামীর জন্য।

তিনি নিজে অপদস্ত হোন ক্ষতি নেই, তাঁকে যে যা বলে বলুক,

কিন্তু শুধু তাঁরই জন্য এত বড় গুণী-মানী তাঁর স্বামীকে যদি লজ্জিত হতে হয় ত কাজ নেই তাঁর এখানে থেকে।

তিনি তাঁর পল্লী গ্রামের বাড়িতেই ফিরে যাবেন বরং তাও ভালো।

যাবার সময় স্বামীকে বলে যাবেন, কিন্তু এই মিতালী ?—তাঁর এই বন্ধুর স্ত্রীটি ?

এরই মধ্যে নানা জনে নানা কথা বলতে আরম্ভ করেছে। বেশীদিন এমন করে একসঙ্গে বাস করলে আরও কত লোকে কত কথাই না বলবে।

মিতালী কাছেই দাঁড়িয়েছিল।

কামিনী তার মুখের পানে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি আর এখানে কতদিন থাকবে ?

মিতালী তার ঠোঁটের ফাঁকে একটুখানি হাসল।

হেসে বললে—কেন দিদি, হঠাৎ ও-কথাটা আমায় জিজ্ঞাসা করলেন কেন ?

কথাটা বলেই কামিনী একটু লজ্জায় পড়লেন। এখন তিনি কি জবাব দেবেন বুঝতে পারলেন না।

খানিক ভেবে বললেন—জিজ্ঞাসা করলাম এমনই।

বুঝতেই ত পারছ ভাই, আমি যদি ওঁর কাছে এখানে থাকতাম তাহলে বা কেউ কোনও কথা বলতো না, কিন্তু তুমি একা।

তাঁর বলবার উদ্দেশ্যটা মিতালী আগেই বুঝেছিল, এখন আবার সেটা আরও পরিস্কার হয়ে গেল।

মিতালী দেখল, সত্য কথাটা তাঁকে জানিয়ে দেবার এই উপযুক্ত সুযোগ।

বলল—আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে দিদি, বলব বলব করেও বলতে পারিনি। আজ বলি, শুনুন—

—কি কথা ? বলে কামিনী ফিরে দাঁড়ালেন।

মিতালী বলল—বলছি।

বলে কামিনী একটা ঢোঁক গিলে সেই ঘরেরই এক কোণের দিকে মেঝের ওপর নিজে বসে কামিনীকেও সেখানে বসবার জন্য অনুরোধ করল।

কামিনী বসলে পরে, মিতালী ধীরে ধীরে বলতে আরম্ভ করল—বর্ধমান শহরের নাম শুনেছেন দিদি ?

কামিনী ঘাড় নেড়ে বললেন—হুঁ। খুব শুনেছি।

মিতালী বলল—সেই বর্ধমান শহরে আমাদের বাড়ি। আমার বাবা ছিলেন সেখানকার একজন বড় উকিল। লতার বাবা প্রায়ই আমাদের বাড়ি যাওয়া আসা করতেন। মামলা মোকর্দমার জন্যে যেতে হতো।

সেবার যখন গেলেন, বাবা তখন মর-মর। আমার ওই এক বাবা ছাড়া নিজের বলতে কোথাও কেউ ছিল না। তাই মরবার আগে লতার বাবাকে কাছে পেয়ে বাবা তাঁর হাত ধরে বললেন—আমার মেয়েটিকে দয়া করে আপনি নিন। আপনাকেই দিয়ে গেলাম।

ওই বলে বাবা এক রকম জোর করেই তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে দিলেন। লতার বাবার কোনও দোষ নেই দিদি, বিয়ে করতে তিনি চাননি।

সত্য-মিথ্যায় জড়িয়ে আসল কথাটা মিতালী বলে ফেলল।

বলল—ওঁর বন্ধুর বৌ বলে আমার যে পরিচয় আপনি পেয়েছিলেন দিদি সে পরিচয় সত্যি নয়।

আমার আসল পরিচয়—আমি আপনার ছোট বোন।

মিতালী হাত বাড়িয়ে কামিনীর পায়ের ধূলা নিতে গিয়ে দেখল—কামিনীর চোখ দুটি তখন জলে ভরে এসেছে।

॥ তেরো ॥

বিজনবাবু সেদিন একটুখানি বেশী রাত করেই বাড়ি ফিরলেন। ভয়ে ভয়ে পা টিপে টিপে ওপরে উঠে গিয়ে দেখলেন, চারিদিক নিস্তব্ধ, কারও কোনও সাড়াশব্দ নেই।

তবে কি খবরটা শুনে কামিনী কোনও কাণ্ড করে বসল নাকি ?

—কিন্তু না।

তাঁর ঘরের সুমুখে একটা লণ্ঠন জ্বলছিল। নিজেই লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে তিনি ঘরে ঢুকলেন।

দেখলেন—তাঁরই ঘরে কামিনী ও মিতালী মেঝের ওপর দুজনেই পাশাপাশি শুয়ে আছে।

লতার ছেলেটিও তাদের কাছে অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছে।

সুরেশ কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিল বোধ করি আদেশের অপেক্ষায়। বিজনবাবু চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলেন—খেয়েছে ওরা ?

ঘাড় নেড়ে সুরেশ বলল—না।

বিজনবাবু তৎক্ষণাৎ বাইরে এলেন। কি যেন জিজ্ঞাসা করবার জন্য সুরেশের কাছে একবার থমকে দাঁড়ালেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা না করেই আবার ভেতরে চলে গিয়ে গায়ের জামা জুতা খুলে গলার একটা শব্দ করে ঘরের বাইরে এসে সুরেশকে বললেন—যা তুই দাঁড়িয়ে রইলি কেন এখানে ?

এই বলে তিনি স্নানের ঘরের দিকে চলে গেলেন।

ফিরে এসে দেখলেন ঘরের ভিতর সুরেশ গড়গড়ায় তামাক দিয়ে গেছে, আর কামিনী উঠে বসছেন।

মিতালীর ঘুম ভেঙ্গেছে কি-না বুঝতে পারা গেল না।

কামিনী জিজ্ঞাসা করলেন—এলে ?

—হুঁ, বলে বিজনবাবু গড়গড়ার নলটা হাতে নিয়ে বসলেন।

কামিনী তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন।

বললেন—খেতে কি রোজ তোমার এমনি দেরী হয় ?

বিজনবাবু বললেন—না।এত দেরি কোনোদিন করো না। শরীর খারাপ হবে।

বিজনবাবু চুপ করে রইলেন।

কামিনী খানিক থেমে কি যেন একটা কথা বলবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নিলেন।

তারপর বললেন—কিন্তু একাজ তুমি করলে কেমন করে ?

কাজটা যে কি, বিজনবাবু তা বুঝলেন।

মিতালী তা হলে বলেছে।

বিজনবাবু ভেবেছিলেন, কামিনী হয়ত কান্নাকাটির পর ভীষণ একটা কাণ্ড করে বসবেন।

কিন্তু সে সব কিছু না করে এমন শান্তভাবে কথাটা তাঁকে বলতে শুনে বিজনবাবু একবার তাঁর মুখের দিকে তাকালেন। দেখলেন, চোখে এতটুকু জল পর্যন্ত নেই। ,

তবে ঝড়ের আগে প্রকৃতি যেমন গম্ভীরভাবে থম্‌থম্‌ করতে থাকে, কামিনী মুখের চেহারাও ঠিক তেমনি।

বিজনবাবু বললেন—কোথায় শুনলে ? কে বলল সে কথা ?

কামিনী সহজেভাবেই জবাব দিলেন—মিতালী বললে।

—হুঁ।

বিজনবাবু বললেন—আর কিছু বলেনি ? শুধু বিয়ে করার কথাটাই বলেছে ?

কামিনী বললেন—সবই বলেছে।

—ভাল ! বুড়ো বয়সে এ অপমান যে আমার অদৃষ্টে ছিল তা

ভাবিনি—রতনপুরে যখন গিয়েছিলাম, তখন যদি বলতে তাহলে লোকের সঙ্গে এমন করে ঝগড়া করতাম না।

কথাটা বলতে বলতে কামিনীর গলার আওয়াজটা ধরে এল।

বললেন—এখন আবার সেই তাদের কাছেই আমাকে যেতে হবে!

বিজনবাবু বললেন—নাই বা গেলে সেখানে? তুমি এখানেই থাকো না।

কামিনী ঘাড় নেড়ে বললেন—না। এখানে থাকতে আমি পারব না! তুমি যে আমার কি—তা কি তুমি—

এতক্ষণ পরে তাঁর চোখ দুটো জলে ভরে এল।

কামিনী চোখের জল মুছছিলেন, বিজনবাবু বললেন—কেঁদো না। যা হবার তা ত হয়েই গেছে।

—এখন শোনো। আমি বলি কি, সুখচরে তোমার আর ফিরে গিয়ে কাজ নেই। তুমি বড়, তুমিই বাড়ির গিন্নী হয়ে এখানেই মিলেমিশে থাকো।

কামিনী বললেন—পাগল হয়েছে! আমি আজই যেতাম, কিন্তু তোমার সঙ্গে একবার দেখা না করে যেতে পারলাম না। কাল সকালেই যাব। তোমার যদি ইচ্ছে হয়, মাঝে মাঝে একবার করে দেখা দিয়ে এসো।

—আর এই ছেলেটাকে মানুষ করছি, যদি মরে যাই ওকে দেখো, ওকে পর করো না।

বিজনবাবু বললেন—কি যে বল তুমি! মরবে কেন! মরবার কি হয়েছে?

—কি হয়েছে তা তুমি বুঝতে পারবে না। আমাকে আরও বেঁচে থাকতে বল? আশীর্বাদ কর, আমি যেন তাড়াতাড়ি চলে যেতে পারি। ছেলেটাকে দেখো।

—ওর জন্যে তুমি ভাবছো কেন? ওরই ত সব!

কামিনী তাঁর ঠোঁটের ফাঁকে ম্লান একটুখানি হাসলেন।

তারপর বিজনবাবুর কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—এত টাকাকড়ি কোথায় তুমি পেলে? রতনপুরের চাকরি ত ছেড়েছ। তাদেরই সর্বনাশ করে এলে নাকি?

বিজনবাবু বললে—তার মানে? কই আমার সম্বন্ধে তোমার ত এরকম ধারণা ছিল না!

কামিনী—বললেন—না। তোমাকে আমি দেবতার মতন বিশ্বাস করতাম। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে তুমি দেবতা নও। তুমি সব পার।

বিজনবাবু মনে মনে বোধ করি একটুখানি রাগ করলেন।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—যদি বলি একসঙ্গে অনেকগুলো টাকা, অনেক বিষয়-সম্পত্তি পাবার লোভে আমি মিতালীকে বিয়ে করেছি, তুমি বিশ্বাস করবে?

কামিনী বললেন—আমি বিশ্বাস না করলেও তোমার কোনই ক্ষতি নেই।

—তা বেশ করেছ। তোমার ছেলেপুলে নেই মিতালীর একটি ছেলে হোক। সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর-সংসার কর আর আশীর্বাদ কর—আমাকে যেন তা চোখে দেখতে না হয়! তবে আমার শুধু ভাবনা এই খোকনের জন্য!

বিজনবাবু বললেন—খোকনের জন্যে ভেবো না।

কামিনী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—নিজের জন্যেও ভাবিনি কোনোদিন। ভেবেছিলাম, তুমিই আমার ষোল আনা। আজ আমার সেই ষোল আনাতেও ভাগ বসলো। কাজেই কপালের কথা কিছু বলা যায় না।

—ও তোমার মেয়ের ছেলে, তোমার বিষয়-সম্পত্তিতে ওর অধিকার

কিছুই নেই। তুমি যদি দয়া করে ওকে দাও তবেই ও পাবে, নইলে পাবে না।

বিজনবাবু বললেন—আমাদের যখন ছেলে নেই তখন ও-ই আমার সব কিছুর মালিক।

কামিনী বললেন—আজ হয়ত মালিক, কিন্তু কাল সে মালিক নাও থাকতে পারে।

এই বলে সেখান থেকে চলে গিয়ে কামিনী মিতালীর গায়ে হাত দিয়ে বললেন—ওঠো মিতালী, আর ঘুমিয়ো না। উনি এসেছেন।

মিতালী ঘুমোয়নি।

ঘুমোবার ভাণ করে শুয়েছিল মাত্র।

বার কতক উঁ-আঁ করে সে উঠে বসল।

মিতালী এত অনুরোধ করল, বিজনবাবু বললেন—কিন্তু কামিনী সেখানে কিছুতেই থাকলেন না। তার পরের দিন সকালেই তিনি সুখচরে ফিরে এলেন।

গেছলেন ট্রেণে চড়ে!

কিন্তু এলেন প্রকাণ্ড এক মোটরে।

গ্রামের লোক প্রথমে ভেবেছিল, বিজনবাবুর চাকরিটি যখন গেছে তখন ভদ্রলোক নিশ্চয়ই একটুখানি বিপন্ন হয়ে পড়েছেন। এবার হয়ত গ্রামে এসেই তাঁকে বাস করতে হবে।

রাণীগঞ্জ শহরে প্রকাণ্ড বাড়ি এবং গাড়ি দেখেও লোকে ততটা বিশ্বাস করতে পারেনি, কিন্তু এখন আর অবিশ্বাসের কিছু রইল না।

লোকে এতদিন যে-কথাটা গোপনে কানাকানি করছিল তাই এখন প্রকাশ্য মজলিশের আলোচনার বস্তু হয়ে উঠল।

সকলেই বলতে লাগল—রতনপুর ষ্টেটটিকে একেবারে ফাঁক করে নিয়ে এসেছেন।

ওকি বাবা কম চালাক।

অনেকে বলতে লাগল—আবার আর একটা নতুন খবর শুনেছ কেউ ?

—কি খবর ?

—বিজনবাবু যে বুড়ো বয়সে আবার একটি বিয়ে করেছেন।

সে কথা সহজে বিশ্বাস করা চলে না।

কেউ করল. কেউ করল না।

কিন্তু বিপদ হোল কামিনীর।

অনেকে তাঁর কাছে এসে এই নতুন সংবাদটার সত্যাসত্য যাচাই করতে চাইল।

কামিনী গোপন করল না।

স্পষ্ট সত্য কথা সকলের মুখের উপরেই তিনি বলে দিলেন।

বললেন—হ্যাঁ। বিয়ে তিনি আবার করেছেন।

মেয়েরা বলাবলি করতে লাগল—মিনসে বিয়ে আবার করলে কেন গা ?

কামিনীকেও যে সে কথাটা দু'একজন না শুনিয়ে গেল তা নয়।

পাড়ার একজন বৃদ্ধা সেদিন বোধকরি এই কথাটা বলবার জন্যই কামিনীর কাছে এসে বসলেন। একথা-সেকথার পর বললেন—তোর কপালটা সত্যিই খারাপ কামিনী।

কামিনী বললেন—সে ত আর নতুন কিছু নয় মা। কপাল ত আমার চিরকালই খারাপ।

বৃদ্ধা বললেন—না মা তা কেন বলছ—তা নয়। সোয়ামী তোমার শুনলাম গঞ্জে বাড়ি তৈরী করেছে, হাওয়া গাড়ি কিনেছে, ভাবলাম

বুঝি এবার আমাদের কামিনী সুখে থাকবে : কিন্তু ওমা! আবার শুনছি আর একটা বিয়ে করেছে। তা হ্যাঁ গা, সেদিন নিজেই ত দেখতে গেলি—বৌটি দেখতে কেমন ?

কামিনী বললেন—দেখতে বেশ ভালই।

বলেই তিনি চুপ করেইছিলেন। কিন্তু প্রতিবেশিনা বৃদ্ধা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে তাঁকে একেবারে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন।

কামিনী বিরক্ত হয়ে গিয়ে বললেন—তা তোমার যদি তাকে একবার দেখতে ইচ্ছে হয়ত বল! ওঁর গাড়িটা একবার পাঠিয়ে দিতে বলি।

বৃদ্ধা হেসে বললেন—না মা, তাকে দেখবার ইচ্ছে আমার নেই। তবে হাওয়া গাড়িতে চাপিনি কখনও, তুই যদি চাপাতে পারিস ত মন্দ হয় না। সে ছুঁড়ির মুখে দু' ঘা খ্যাংরা মেরে আসি।

এ-কথার কি জবাব দেবেন কামিনী ভেবে পেলেন না।

জবাব দিতে হলে শক্ত করেই দিতে হয়। কাজেই চুপ করে রইলেন।

বৃদ্ধা বললেন—চুপ করে রইলি যে ?

কামিনী বললেন—তোমার বাড়িতে কি কোন কাজ নেই মা ?

—কাজ!—হ্যাঁ, কাজ আমার আছে। তবে বলছিলাম কি তোর কপাল বড় মন্দ, বুড়ো বয়সে সতীন হলো—তা সতীনকে দূর করে দিয়ে তুই সেইখানে গিয়ে থাকগে যা। আমি তোকে ভাল কথা বলছি শোন্।

কামিনী বললেন—ভাল কথা আমাকে আর বলতে হবে না মা, তুমি ওঠো দেখি। উঠোনটা আমি পরিস্কার করব।

এই বলে তিনি একটা ঝাঁটা হাতে নিয়ে বুড়িকে বিদায় করলেন।

॥ চৌদ্দ ॥

এইসব উপসর্গগুলো মাঝে মাঝে তাঁকে বিরক্ত করে। তা না হলে নিজের দুঃখ নিয়ে নিজেই তিনি কোনরকমে দিন কাটান।

লতার ছেলেটিকে নিয়ে দিবারাত্রি ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু ছোট ছেলে সন্ধ্যার পূর্বেই ঘুমিয়ে পড়ে।

পল্লীগ্রামের ওপর অন্ধকার নেমে আসে।

নিস্তব্ধ নির্জন পল্লীর পথ ঘাটে ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা ঝিম্ ঝিম্ শব্দ শোনা যায়। দূরের মাঠে মাঝে মাঝে শেয়াল ডেকে ওঠে।

হ্যাংলা কুকুরগুলো পথে পথে সারাদিন খাওয়াখাওয়ি করে বেড়ায়।

কামিনী নিজে খেয়ে ঝিকে খাইয়ে ছেলেটাকে বুকের কাছে নিয়ে শুয়ে পড়েন।

বৃদ্ধা এই দাসীটি অনেকদিনের। যেমন অনুগত, তেমনি বিশ্বাসী।

কামিনী জিজ্ঞাসা করেন—আচ্ছা ফেলু, তোমার যদি এমনি হতো তাহলে তুমি কি করতে?

ফেলু বলে—তা আমি কেমন করে বলব মা। সেই কথায় আছে না, ভেড়া আর মেয়েমানুষ দুই-ই সমান। আমাদের কি আর কোনও জোর আছে বাছা! কিছুই করতাম না, মুখ বুজে চুপ করেই থাকতাম।

কামিনী বললেন—আমাকেও কি তাই থাকতে বল?

ফেলু বলল—তাছাড়া কি আর করবে মা? বাবু যখন এমন একটা কাজ করেই ফেলেছেন—

—তাই বলে আমাকে চুপ করে থাকতে হবে? না ফেলু তা আমি পারব না।

—তা হলে কি করবে মনে করেছ ?

কামিনী বললেন—আমি যাব। ছেলেটাকে কোলে নিয়ে বাবুর কাছে আবার যাব ভাবছি। গিয়ে কি করব জানো? ছেলেটাকে বাবুর পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে যেদিকে দুচোখ যায় সেই দিকে চলে যাব। পথে পথে ভিক্ষে করে খাব সেও বরং ভালো।

ফেলু মেঝের ওপর শুয়েছিল, কথাটা শুনে উঠে বসল।

বলল—ছিঃ মা ছিঃ ওরকম কথা বলো না ছিঃ! ওই নাতিটি তোমার বেঁচে থাক্—দেখবে ওই তোমার সব হবে।

এমনি সব নানান কথা বলে ফেলু তাঁকে অনেকক্ষণ ধরে সান্ত্বনা দেয়।

এমন শুধু একদিন নয়। প্রত্যহ।

রাত্রি হলেই কামিনীর বুকের ভেতরটা কেমন যেন করতে থাকে।

স্বামীর অবিচারের কথা মনে করে একাকিনী শুয়ে শুয়ে খানিকটা কাঁদেন, তারপর ফেলুর সঙ্গে কথা কইতে কইতে হঠাৎ এক সময় হয়ত ঘুমিয়ে পড়েন।

এমনি চলছিল।

কিন্তু মানুষের জীবন একই খাতে চিরকাল বয় না।

বছর দুই পরে দেখা গেল, কামিনী তার সব শোকই ভুলেছেন।

খোকা বড় হয়েছে। এখন আর তাকে খোকা বলে কেউ ডাকে না।

খোকার নামকরণ হয়েছে—গোপাল।

গোপাল! দিব্যি ফুটফুটে সুন্দর ছেলেটি।

কামিনীর আজকাল তাকে নিয়েই সময় কাটে।

অর্থের ভাবনা কোনোদিনই ভাবতে হয় না।

স্বামী না আসুন—টাকাকড়ি তাঁর কাছে ঠিক সময়েই এসে পৌঁছে। এবং পরিমাণটা যা তাকে এই কয়টি প্রাণীর পক্ষে যথেষ্টই বলতে হবে।

বিজনবাবু এই দু'বৎসরে নাকি প্রচুর অর্থ উপার্জন করে বড়লোক হয়েছেন। সুখচর গ্রামখানি এখন তাঁরই।

কোথাকার কোন্ জমিদারের কাছে তিনি এ গ্রামের দরপত্তনীস্বত্ব কিনে নিজেই জমিদার হয়েছেন।

কামিনী এখন জমিদার গৃহিণী।

মাটির ঘর ভেঙে প্রকাণ্ড দোতালা দালান তৈরী হয়েছে। জমিদারের কাছারী হয়েছে।

কামিনীর আদেশ প্রতিপালন করবার জন্যে লোকজন এখন জোড়-হস্তে দাঁড়িয়ে থাকে।

বিজনবাবু সেদিন তাঁর জমিদারী পরিদর্শন করবার জন্যই কি-না জানি না, প্রকাণ্ড এক মোটরে চড়ে সুখচরে এলেন।

গ্রামে এখন তাঁর সম্মান প্রতিপত্তির অন্ত নেই।

দুপুরে আহারাদির পর তিনি বিশ্রাম করছেন, গোপালকে সঙ্গে নিয়ে কামিনী তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

বিজনবাবু উঠে বসলেন। দু' হাত বাড়িয়ে গোপালকে তাঁর বুকের ওপর তুলে আদর করতে লাগলেন।

কামিনী বললেন—গোপালকে তোমার ভাল লাগে তাহলে?

বিজনবাবু তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলেন শুধু।

কামিনী বললেন—আহা, গরীবের ছেলে—মানুষ করছি দুঃখু যদি ওর ঘোচে ত বুঝতে হবে ওর কপাল ভালো।

বিজনবাবু বললেন—তোমার অভিমান কিন্তু এখনও গেল না। তুমি এখানে থাকো তাই তোমার জন্যে জমিদারী কিনলাম।

কামিনী বললেন—টাকা পয়সায় মনের দুঃখ ঘোচে না। সেকথা বোধ হয় তুমি জানো।

এই বলে কামিনী তাঁর পায়ে হাত দিয়ে একটি প্রণাম করলেন।

এরই কিছুদিন পরে একটা ভীষণ দুঃসংবাদ কামিনীর কাছে এসে পৌঁছাল।

সংবাদটা এতদিন বোধ করি বিজনবাবু চেপে রেখেছিলেন। সহসা একদিন খবর এলো—মিতালীর একটা পুত্রসন্তান হয়েছে।

এ আশঙ্কা যে কামিনী না করেছিলেন তা নয়। সেই আশঙ্কাই সত্যে পরিণত হলো।

আজ আর কামিনীর ভাববার, দুঃখ করবার কিছু রইলো না।

ভগবান যা করেন তাই হবে।

গোপালকে কোলে নিয়ে কামিনী খানিকটা কাঁদলেন।

কেঁদে কেঁদে অবশেষে একসময় নিজেই চুপ করে সংসারের কাজকর্মে মন দিলেন।

ছেলে হবার পর লজ্জায় বোধকরি আর বিজনবাবু স্নখচরে এলেন না।

কামিনীর লজ্জা তখনই সব চেয়ে বেশী হয়, গ্রামের লোক যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করে বসে—হ্যাঁ গা, শুনলাম নাকি তোমার সতীনের একটি ছেলে হয়েছে ?

এই নিয়ে লোকের সঙ্গে ঝগড়া তিনি করতে চান না। এসব কথার জ্বালা তাঁকে সহ্য করতেই হবে।

কামিনী বলেন—হ্যাঁ তাই ত শুনছি।

কামিনীর কাছে আর বেশী কিছু লোকে বলে না। কিন্তু আড়ালে আবডালে সবাই বলাবলি করে—যাক এতদিন পরে বিজনবাবুর বংশ রক্ষা হলো।

ভালই হয়েছে। ছেলে না হলে বংশটা লোপ পেয়ে যেতো।

অনেকে বললেন—ভাল হয়তো হলো। কিন্তু কামিনীর দশা কি দাঁড়াবে কে জানে।

মেয়েটা মরে যাওয়ার পর থেকে তার ছেলেটাকে চোখের আড়াল করেননি তিনি।

বুক থেকে নামায় নি পর্যন্ত।

ছেলেটার বরাতে যে কি আছে কে জানে।

এত সব থাকতে বিজনবাবু কেন যে আবার বিয়ে করলেন তা তিনিই জানেন।

বড়লোকদের খেয়াল বোঝা শক্ত।

॥ পনেরো ॥

দশ বছর পরের কথা।

বিজনবাবুর ছেলের নাম রাখা হয়েছে রাজকুমার। আদর করে সবাই ডাকে রাজাবাবু বলে।

অনেকেই সন্দেহ করেছিলো, বেশী বয়সের ছেলে, বাঁচে কিনা সন্দেহ। কিন্তু সকলের সন্দেহ নির্ম্মুল করে দিয়ে রাজকুমার বেশ ভালভাবেই বেঁচে রইল।

বড় লোকের একমাত্র ছেলে আদর যত্নের অন্ত নেই। চেহারাও হয়েছে চমৎকার। সাদা ধপধপে গায়ের রং, বড় বড় চোখ, মুখখানি বড় সুন্দর।

বিজনবাবু ত ছেলে বলতে অজ্ঞান।

বৃদ্ধ হয়েছেন। এখন আর তিনি কাজকর্ম বড় একটা করেন না। করবার প্রয়োজনও হয় না।

কর্মচারীদের ওপরেই বিষয় সম্পত্তি দেখাশোনার ভার দিয়ে এখন তিনি যেন একটুখানি নিশ্চিন্ত হয়ে জীবন যাপন করতে চান।

কিন্তু তা চাইলেই বা হয় কই!

বাইরে নির্বিকার নির্লিপ্ত ভাব তিনি দেখান বটে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে নজর তাঁর সব দিকেই থাকে। কাজেই ফাঁকি দিয়ে কারও কিছু আত্মসাৎ করবার উপায় নেই।

বিজনবাবু বললেন—এবার একটা উইল করতে হবে।

মিতালী বলে—কেন উইল কি জন্যে করবে?

—বয়েস হয়েছে হঠাৎ কোন্‌দিন মরে যাব, উইলটা করে রাখা ভাল।

মিতালী বলে—ছাখো বাবু, ওই মরবার কথাটা তুমি আমার কাছে বলো না আর। আমি তোমার আগে মরতে চাই। উইলের কথাটা শুনলেই আমার বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে।

বলতে বলতে তার দুচোখ জলে ভরে আসে। উইলের কথাটা সেখানেই চাপা পড়ে যায়।

বিজনবাবুর একটি মাত্র ছেলে, উইল না করলেও বিষয় সম্পত্তি সে-ই পাবে। কাজেই সেদিক দিয়ে উইলের খুব বেশী প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

বিজনবাবু তা জানেন। তবু তিনি যে উইল করতে চান তা শুধু তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রী কামিনী আর তাঁর দৌহিত্র গোপালের জন্য।

যে গোপাল একদিন তাঁর বিষয় যাবতীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ছিল। আজ আর সে সম্পত্তিতে তার এক কাণাকড়িরও অধিকার নেই।

হাতে তুলে বিজনবাবু যদি কিছু তাকে না দিয়ে যান ত সে কিছুই পাবে না। সেই জন্যই বিজনবাবুর এত আগ্রহ।

এদিকে মিতালী চায়—তার ছেলেই যেখানে ষোল আনার মালিক সেখানে অপরে ভাগ বসাবে কেন? আর তাছাড়া ওই বিষয় সম্পত্তি এবং টাকাকড়ির বেশীর ভাগের মালিক সে নিজে।

তবে হ্যাঁ, মেয়ের ছেলেটাকে ছেলেবেলা হতে মানুষ যখন করা হয়েছে তখন তাকে একেবারে বঞ্চিত করে কাজ নেই।

লেখা পড়া শিখিয়ে দেওয়া হোক, তারপর বিয়ে দিয়ে সুখচরের বাড়িতেই সে বৌ নিয়ে বাস করুক।

নিজে রোজগার করে সংসার চালাতে পারে ভালই—না পারে, এখানকার জমিদারী হতে সংসারের খরচ তাকে দেওয়া হবে। এর চেয়ে ভাল কিছুই হতে পারে না। এর জন্য উইলের কোন প্রয়োজন নেই।

মিতালীর ভয় হয় বিজনবাবু উইল করতে গিয়ে অর্ধেক সম্পত্তিই গোপালের নামে লিখে বসবেন কিনা তাই বা কে জানে।

সেই জন্যই সে যেমন করে পারে উইলের কথা উঠলেই সেটা চাপা দেবার চেষ্টা করে।

বিজনবাবুর লুকিয়ে কিছু করবার উপায় নেই।

মিতালী শিক্ষিতা বুদ্ধিমতী মেয়ে। সবই হয়ত সে ধরে ফেলবে—তখন আর কেলেঙ্কারীর বাকী কিছু থাকবে না।

বিজনবাবু কি বিপদে পড়েছেন।

অথচ মিতালী মুখে এমন সব কথা বলে যা শুনে বিজনবাবু একটুখানি আশ্বস্ত হন।

মিতালী বলে—গোপালের জন্য তুমি ভেবো না। গোপালকে যা দিতে হয় আমি দেবো।

গোপাল আর রাজা—আমার কাছে দুই সমান। বিষয় সম্পত্তি ওদের দুজনকে আমি সমান ভাগে ভাগ করে দেবো—তুমি দেখো।

বিজনবাবু হেসে বলেন—দেখতে হয়ত পাব না বলেই ভাবছিলাম, যা দিতে হয় একটা উইলে লিখে দিয়ে যাই।

মিতালী বলে—আমার মনের কথা তবে শুনবে?

গোপালকে যা কিছু দিতে হয় আমি নিজের হাতে দেবো। হাজার হলেও আমি তার দিদিমার সতীন। আমার হাত দিয়ে বিষয় সম্পত্তি যদি সে পায় ত আমাকে তবু একটুখানি খাতির সম্মান করবে।

বিজনবাবু বলেন—ব্যস, এবার আমি নিশ্চিন্ত।

গোপালের জন্মাবধি আমি প্রতিশ্রুত হয়েছি, আমার সে প্রতিশ্রুতি যেন বজায় থাকে। নইলে অধর্ম হবে।

মিতালী বলে—তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। এত বড় অধর্ম আমি করব না।

সেই বিশ্বাসে বিজনবাবু নিশ্চিন্ত হয়েই থাকেন। উইলের কথা আর মুখ দিয়ে উচ্চারণও করেন না।

কামিনী অনেকদিন হতে বিজনবাবুকে একবার দেখতে চান।

তাঁর বয়েস হয়েছে অনেক। হে ভগবান, গোপালের যা হোক একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে এবার যেন তিনি স্বামীর পায়ে মাথা রেখে মরতে পারেন।

বৈধব্য যন্ত্রণা যেন তাঁকে আর সহ্য করতে না হয়।

কামিনী সেদিন গোপালকে দিয়ে বিজনবাবুকে একখানি চিঠি লিখে পাঠালেন।

চিঠি পেয়ে দিন-দশ পরে বিজনবাবু একদিন সুখচরে এলেন।

স্বামীকে ভক্তিভরে প্রণাম করে কামিনী একদৃষ্টে তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ এক সময় ঝর্ ঝর্ করে কেঁদে ফেললেন।

বিজনবাবু ব্যথিত হলেন।

বললেন—কাঁদছো কেন ? কি হয়েছে ?

—তোমার আগে আমি এবার যেতে চাই। সেইজন্যেই তোমাকে একবারটি দেখবার জন্য ডেকেছিলাম। আর একটা কথা ছিল।

বলে তিনি ডাকলেন—গোপাল !

গোপাল কাছে এসে দাঁড়াতেই কামিনী গোপালের একখানি হাত তাঁর স্বামীর হাতে তুলে দিয়ে বললেন—একে আমি মানুষ করেছি। যাবার আগে তোমাকেই দিয়ে গেলাম। যা হয় এর ব্যবস্থা একটা করো।

বিজনবাবু বললেন—ব্যবস্থা করেছি। সেজন্যে তুমি ভেবো না।

কামিনী বললেন—আমি যদি দেখে যেতে পারতাম তাহলে বড় ভালো হতো।

—আচ্ছা তাই হবে। বলে কোনরকমে নিষ্কৃতি পেয়ে বিজনবাবু সেখান থেকে ফিরে এলেন।

এতদিন পরে দুই-সতীনের ঝগড়াটা যেন জোরে বাধল—কোন লুকোচুরির বালাই না রেখে।

বিজনবাবু ফিরে আসতেই মিতালী ধরে বসল—কি জন্যে উনি তোমায় ডেকেছিলেন বল ত?

—ডেকেছিল কি জন্যে ঠিক বুঝলাম না মিতালী।

আমাকে একটি প্রণাম করে সে শুধু বললে—তোমার আগে আমি এবার মরতে চাই।

আসল কথাটা তিনি গোপন করলেন।

মিতালী কিন্তু তা বিশ্বাস করল না।

বললে—না, তা নয়। আরও কিছু বলেছে, তুমি আমায় বলছ না।

বিজনবাবু বললেন—না আর কিছু বলেনি। কেন, তোমার কি কিছু সন্দেহ হয়েছে?

—আমার সন্দেহ ত হচ্ছে। উইল করে সম্পত্তির অর্দ্ধেক গোপালের নামে লিখে দিয়ে এলে কিনা তাই বা কে জানে।

বিজনবাবু চমকে উঠলেন।

সর্ব্বনাশ! এ বলে কি?

বললেন—এমন কথা কেন বলছ তুমি? তাকে ত কিছু দিতেই হবে।

—সে ত তোমাকে আগেই আমি বলেছি। তাকে যা দিতে হয়

আমি দেবো। আর কেন দেবো তাও তো বলেছি। তোমার যদি বিশ্বাস না হয়ত দাওগে যাও, আমি কিছু বলতে চাই না।

বিজনবাবু বললেন—তোমাকে অবিশ্বাস আমি করিনি মিতালী। তুমি দিও।

—দরকার নেই আমার দেওয়ার।

—রাগ করলে মিতালী !

—রাগ করে কি করবো বলো—আমার কথাটা যখন তোমাদের কারো বিশ্বাসই হয় না—তখন তোমার সম্পত্তি তুমি বিলিয়ে দাও—যা খুশি করো আমি আর কিছু বলবো না।

বিজনবাবু এবার যেন একটু শক্ত হলেন।

বললেন—তোমার এই অবিশ্বাস আর অভিমানই হয়ত একদিন বিপর্যয়কে ডেকে আনবে।

॥ ষোল ॥

মাস পাঁচ-ছয় পরে সুখচর হতে হঠাৎ একদিন নায়েব এসে উপস্থিত হলো।

নায়েবের মুখের চেহারা দেখেই বিজনবাবুর কেমন যেন সন্দেহ হলো।

জিজ্ঞাসা করলেন—কি হে, কোনও খারাপ খবর আছে নাকি?

নায়েব বলল—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি চলুন আমার সঙ্গে। বড় মা বোধ হয় আর বাঁচবেন না। আপনাকে ঘন ঘন দেখতে চাচ্ছেন।

বিজনবাবু বলে উঠেন—অসুখ! কবে থেকে হয়েছে? কই আমি তো কিছু জানিনা!

নায়েব বলল—আমি ত চিঠি লিখে আপনাকে জানিয়েছিলাম।

—কবে?

—গত রবিবার সকালে। লোক দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলাম।

—লোকটা ফিরে গিয়ে কি বললে?

—বললে বাবুর দেখা পেলাম না।

ছোটমা চিঠি পড়ে বললেন—বাবুর শরীর খুব খারাপ। ডাক্তারেরা চলতে ফিরতে বারণ করেছে। এ সময় তিনি যাবেন কেমন করে।

মিতালী কাছে ছিল না। বিজনবাবু একবার এদিক ওদিক তাকালেন।

বললেন—তুমি কি সেকথা জানিয়েছ তোমার বড় মাকে?

নায়েব ঘাড় নেড়ে বলল—আজ্ঞে না। আমি শুধু বলেছি বাবু আসছেন।

দু'জনেই চুপ করে কি যেন ভাবতে লাগলেন।

বিজনবাবু প্রথমে কথা কইলেন।

বললেন—অসুখ কি খুব বেশী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, কাল পর্যন্ত ভেবেছিলাম এযাত্রা বুঝি বেঁচে গেলেন। কিন্তু ডাক্তার আজ সকালে রুগী দেখে বললেন—আর আশা নেই, আপনি একবার বাবুর কাছে যান।

বিজনবাবু উঠে দাঁড়ালেন।

বললেন—বোসো তুমি, আমি আসছি।

কাছেই একজন চাকর দাঁড়িয়েছিল।

বিজনবাবু বললেন—গাড়ি আনতে বল।

এই বলে তিনি ভেতরে চলে গেলেন।

বিজনবাবুকে জামাকাপড় পরতে দেখে মিতালী জিজ্ঞাসা করল—কোথায় যাবে?

—আসছি। সন্ধ্যার আগেই ফিরব।

বলেই বিজনবাবু তাড়াতাড়ি বের হয়ে গেলেন।

নীচে গাড়ি দাঁড়িয়েছিল।

গাড়িতে উঠবার আগে চাকরটাকে তিনি চুপি চুপি বলে গেলেন—সুখচরে যাচ্ছি, তা যেন তোর মাকে বলিসনি সুরেশ। গাড়ি ছেড়ে দিল!

বিজনবাবু ভাবতে লাগলেন—ছি-ছি বৃদ্ধ বয়সে এ কী বিড়ম্বনা তাঁর! মরণাপন্ন স্ত্রীকে একটিবার শেষ দেখা দেখতে যাবেন তাও বলে যাবার উপায় নেই।

বললে মিতালী হয়ত নিষেধ করত। অসুস্থ শরীরের দোহাই দিয়ে হয়ত সে কিছুতেই তাঁকে ছেড়ে দিত না।

সারা পথ তিনি শুধু কামিনীর কথাই ভাবলেন।

বিয়ের পর হতে আজ পর্যন্ত তাকে তিনি শুধু অবহেলাই করে এসেছেন।

সময় যখন তার খারাপ ছিল তখন সে নিতান্ত দরিদ্রের মত সকল রকমের দুঃখ কষ্টই হাসিমুখে সহ্য করেছে। সময় যখন ফিরল তখনও তাকে তিনি সুখেরাখতে পারেন নি।

একদিক হতে ভগবান তাকে দুঃখ দিয়েছেন, আর এক দিক হতে দিয়েছেন তিনি নিজে।

চিরজীবন শুধু দুঃখের বোঝা বয়েই আজ সে মরতে বসেছে।

মরুক! তার মৃত্যুই ভাল, এমন বাঁচা বেঁচে কোন সুখ নেই। তবে দুঃখ শুধু গোপালের জন্য।

ছেলেটা বাল্যাবধি মা জানে না, বাবা জানে না, জানে শুধু তাকেই।

ভাবনা তখনও তাঁর শেষ হয়নি।

এমন সময় গাড়ি এসে দাঁড়াল তাঁর বাড়ির দরজায়।

এতদিন পরে বিজনবাবুর মনে হতে লাগল কামিনীর কাছে তিনি সত্যিই অপরাধী।

এ অপরাধের ক্ষমা নেই।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তাঁর বুক ভেদ করে।

রোগীর ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখলেন, গোপাল কাঁদছে।

গোপালের কান্না দেখে সহসা তাঁর নিজের চোখ দুটোও জলে ভরে এল।

জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন রয়েছে এখন?

গোপাল কোনও কথা বলল না, কাঁদতে কাঁদতেই তাঁর পিছু পিছু রোগীর শিয়রের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

কামিনী নির্জীবের মত পড়ে আছেন। এক একবার চোখ মেলছেন আর ঘন-ঘন শ্বাস টানছেন।

বিজনবাবু তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই কামিনী একবার চোখ মেলে চাইলেন।

স্বামীকে চিনতে পারলেন কিনা কে জানে। দেখা গেল চোখের কোণ বয়ে দর দর করে জল গড়িয়ে পড়ল।

কিন্তু সেই যে তিনি চোখ চাইলেন, সে-চোখ আর তিনি বন্ধ করতে পারলেন না।

নিষ্প্রভ দুই চোখের সুমুখে স্বামীকে দেখতে দেখতেই জীবনের দীপ নিভে গেল।

আশ্চর্য মৃত্যু!

বলেছিলেন, স্বামীকে সামনে রেখে তিনি মরতে চান। ভগবান তাঁর আর কোনও সাধ পূর্ণ করেননি—কিন্তু সে সাধটুকু তাঁর অপূর্ণ রাখলেন না।

স্বামী যদি আর কিছুক্ষণ আগে আসতেন। হয়ত তিনি মরবার সময় দুটো কথা বলতে পারতেন। হয়ত বা গোপালকে তাঁর হাতে সমর্পণ করে দিয়ে তাঁর কর্তব্য শেষ করে যেতে পারতেন। কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না।

কণ্ঠ তখন তাঁর রুদ্ধ হয়ে গেছে! জীবনীশক্তি বোধ করি আর অবশিষ্ট ছিল না। তাই তিনি তাঁর চোখের জলে শেষ মিনতি জানিয়ে গেলেন কিনা তাই বা কে বলতে পারে?

মুখাগ্নি করল গোপাল। সেই তাঁর সন্তানের অধিক।

শবদাহ শেষ করে গোপালকে সঙ্গে নিয়ে বিজনবাবু যখন গঙ্গে ফিরলেন, তখন রাত্রি বারোটা।

মিতালী স্বামীর জন্য উদগ্রীব হয়ে জেগে বসেছিল।

গোপালকে সঙ্গে দেখে কি যেন একটা কটু কথা সে মুখে উচ্চারণ

করতে গেল, কিন্তু বিজনবাবু তা সামলিয়ে নিলেন—কামিনীর মৃত্যু সংবাদ দিয়ে।

মিতালী জিজ্ঞাসা করল—তার অসুখের খবর তুমি কোথায় পেলে ?

বিজনবাবু মিথ্যা বললেন।

বললেন—পথে।

—কখনো নয়।

—তোমার কি ধারণা ?

—আমার ধারণা—তুমি মিথ্যা বলছো।

—তাই যদি বলি—তাতে দোষ কি হয়েছে বল তো মিতালী ! সে-ও তো আমার বিবাহিতা স্ত্রী।

—আর আমি বুঝি তোমার বিবাহিতা স্ত্রী নই ? তুমি বুঝি আমার বাবার জমানো টাকাকেই বিয়ে করেছ—আমাকে নয়। শয়তান কোথাকার।

মিতালীর দম্ভোক্তি শুনে বিজসবাবু স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

॥ সতেরো ॥

গোপাল ও রাজকুমার দু'জনে একসঙ্গে একই ইস্কুলে পড়তে যায়।

মোটরেই ফিরে আসে।

তাদের দু'জনের মধ্যে কোথাও যে কোন পার্থক্য আছে গোপাল প্রথমে তা বুঝতে পারেনি।

কিন্তু যতই দিন যায়, ততই যেন সে টের পায়। আগে তারা দুজনে একসঙ্গে বসেই খেত। কিছুদিন যেতে না যেতেই দেখল সে নিয়মের বদল হয়েছে।

রাজকুমারের খাবার যায় দোতলায়, তার মা তাকে সামনে বসিয়ে খাওয়ায়, আর গোপাল খায় নিচে।

রাঁধুনী মেয়েটি যা দেয় তাই সে খেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে।

রাজকুমারকে তার মা খাওয়াচ্ছে—কথাটা সে ভাবতেও চায় না। ভাবতে গেলেই তারও বিগত দিনের কথা মনে পড়ে।

কামিনীকে সে মা বলে ডাকত। তারও মা তাকে ঠিক এমনি করেই খাওয়াত। এমনিই ভালবাসত।

মার কথা মনে পড়লেই চোখ মুছে খাবারের থালা ফেলে দিয়ে সে উঠে পালাত।

পোষাক পরিচ্ছদেরও পার্থক্য যথেষ্ট।

কিন্তু সে সব গোপাল লক্ষ্য করে না।

তার একমাত্র লক্ষ্য পড়ার দিকে।

ইস্কুলের শিক্ষকেরা তাকে ভালবাসেন। প্রতিবার পরীক্ষায় সে প্রথম স্থান অধিকার করছে।

বৃত্তি নিয়ে সে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করতে চায়!

ইস্কুল হতে বাড়ির গার্জেনের কাছে রিপোর্ট পাঠান হয়।

রিপোর্ট দুখানি হাতে নিয়েই বিজনবাবু সেদিন মিতালীকে কাছে ডাকলেন।

বললেন—দেখে যাও মজা।

মিতালী দেখল—রাজকুমারের রিপোর্ট অত্যন্ত খারাপ।

বলল—তাতে কি হয়েছে? এরকম হয়েই থাকে!

বিজনবাবু বললেন—সে কি গো। তোমার মুখে এই কথা। অশিক্ষিতা মায়েরা বরং যা বলে তাই সাজে। কিন্তু তুমি নিজে লেখাপড়া শিখে ছেলেকে মূর্খ করতে চাও নাকি?

মিতালী বললে—কি করব বল। বাড়ীতে মাস্টার, ইস্কুলে মাষ্টার তাতেও যদি ছেলে কিছু না শেখে ত সে কি আমার দোষ?

মিতালীর চোখ দুটো ছল ছল করতে লাগল।

বিজনবাবু ডাকলেন—রাজা।

রাজকুমার কাছে এসে দাঁড়াল।

বিজনবাবু বললেন—এ কি বাবা, তোমার ইস্কুলের হেডমাষ্টার লিখেছেন তুমি ভাল পড়াশুনা করছ না। এ ত ভাল কথা নয়। আর ওই ত তোমার সঙ্গেই রয়েছে গোপালের রিপোর্ট, ওর রিপোর্টটা দেখেছ?

রাজকুমার মাথা হেঁট করে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

বিজনবাবু বললেন—যাও—এবার কিন্তু তোমার রিপোর্ট যেন ভাল হয়।

রাজকুমার কাঁদ কাঁদ মুখে চলে গেল।

মিতালী বললে—ভাল করে পড়িস বাবা এবার থেকে। নইলে দেখলি তো তোর বাবা আমাকেই দোষ দিলেন।

রাজকুমার বললে—রিপোর্ট দুটো গোপাল ত বাবাকে না দিলেই পারত মা।

মিতালী বললে—না বাবা, এতে গোপালের কি দোষ, দোষ তোমার। তুমি মন দিয়ে পড় না।

—না মা, তুমি জানো না, গোপাল নিজে ভাল পড়ে কিনা তাই দেখাবার জন্যে বাবাকে ও রিপোর্ট দুটো দেখিয়েছে।

দাঁড়াও আমি দেখাচ্ছি গোপালকে।

মিতালী বললে—নারে না, ওকে কিছু বলিসনি, তোর বাবা রাগ করবেন।

রাজকুমার গর্জাতে লাগল—না, বলবে না।

মিতালী তাকে অনেক করে বুঝাল, কিন্তু রাজকুমার আদুরে ছেলে —কারও কোনও কথাই সে শুনল না।

তার পরদিন ইস্কুলে যাবার সময় গোপাল গাড়িতে চড়তে যাবে রাজকুমার বললে—তুমি হেঁটে ইস্কুলে যাও গোপাল, আমার গাড়িতে তোমায় আমি চড়তে দেবো না।

ড্রাইভার বললে—ছি রাজাবাবু, ওকি !

রাজাবাবু কিন্তু শোনবার পাত্র নয় ! ঘাড় নেড়ে গোঁ ধরে বসল— না কিছুতেই না !

গোপাল কোনও কথাই বলল না। হাসতে হাসতে সে হেঁটেই চলল।

ইস্কুল হতে ফেরবার সময়েও তাই।

ছুটির কিছু আগেই রাজাবাবু গাড়িতে এসে বসল। ড্রাইভারকে বলল—চালাও।

—গোপাল আসুক।

রাজাবাবু বলল—আমি বলছি তুমি চালাও ড্রাইভার নইলে ভাল হবে না।

ড্রাইভার যতীনকে বাধ্য হয়ে গোপালকে না নিয়েই বাড়ি ফিরতে হলো।

গোপাল অবশ্য সেকথা কাকেও জানাল না।

প্রায় মাসাধিক কাল সে হেঁটে ইস্কুলে যায় আসে।

রাজকুমার তার সঙ্গে কথাও বলে না।

বৈকালে সেদিন গাড়ি নিয়ে বিজনবাবু কোথায় যেন যাবেন।

· গাড়ি ইস্কুলে গেছে ছেলেদের আনবার জন্যে। তারই অপেক্ষায় তিনি বাইরের ঘরে বসে আছেন। এমন সময় গাড়ি এলো একা রাজকুমারকে নিয়ে।

বিজনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—গোপাল কোথায়?

—আসছে। বলে রাজকুমার তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে গেল।

ড্রাইভার বলল—সে আজ মাসখানেক ধরে হেঁটে হেঁটেই যায় হেঁটে হেঁটেই আসে।

বিজনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—কেন?

ড্রাইভার বললে—দু'জনের কিসের যেন ঝগড়া হয়েছে। রাজাবাবু তাকে গাড়িতে চড়তে দেন না।

তখন আর তাঁর সময় ছিল না! ফিরে এসেই বিজনবাবু গোপালকে ডেকে পাঠালেন।

জিজ্ঞাসা করলেন—হেঁটে হেঁটে স্কুলে যাও শুনলাম—কেন?

গোপাল একটু হেসে বললে—এমনি। এ আর কতটুকুই বা রাস্তা।

—রাজা কিছু বলেছে তোমায়?

গোপাল হেঁট মুখে দাঁড়িয়েছিল।

ঠিক তেমনি ভাবেই বললে—না।

বিজনবাবু কিছুক্ষণ পরে বললেন—যাও।

॥ আঠারো ॥

তার পর থেকে কি যে হলো বিজনবাবুর কিছু বুঝা গেল না।

দিনের প্রায় অধিকাংশ সময় বাড়ির বাইরে বাইরে কাটাতে লাগলেন।

সন্ধ্যায় যখন বাড়ি ফেরেন, তখন কিছু বুঝা যায় না।

সবার সঙ্গে আগে যেমন কথা বলতেন এখনও তেমনি বলেন। তবু মিতালী কেমন যেন সন্দেহ করলে।

বললে—কয়েকদিন ধরে দেখছি, তুমি কি যেন ভাবছো মনে হচ্ছে।

—কই না কিছুই তো ভাবিনি।

—তাহলে শরীরটে তোমার খারাপ হয়ে যাচ্ছে কেন?

—ও কিছু নয়। বয়েস তো হয়েছে।

এই বলে বয়সের দোহাই দিয়ে যেন তিনি গোপন করতে চাচ্ছিলেন। কয়েক মাস পরে আর কিছুই গোপন রইলো না।

বিজনবাবু শয্যা গ্রহণ করলেন।

ডাক্তার এলেন। ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে বললেন—প্রেসার অত্যন্ত। আপনি একটু সাবধানে থাকুন।

সাবধানেই তিনি ছিলেন।

ডাক্তার যেমন যেমন ওষুধ খেতে বলেছিলেন তেমনি নিয়ম করে ওষুধও খাচ্ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ একদিন স্নানের ঘরে আছাড় খেয়ে পড়ে গেলেন।

ধরাধরি করে ঘরে এনে শুইয়ে দেওয়া হলো বিজনবাবুকে।

কিন্তু সেই শোয়াই হোলো তাঁর শেষ শোওয়া।

শয্যা ছেড়ে আর তিনি উঠলেন না।

ডাক্তার এলেন, ইঞ্জেকশান দিলেন, ওষুধ দিলেন, কিন্তু আর কিছুতেই কিছু হলো না।

চারদিনের দিন তিনি অচৈতন্য অবস্থায় মারা গেলেন।

যাবার সময় একটি কথাও তিনি কাউকে বলে যেতে পারলেন না।

কাঁদলে মিতালী, কাঁদলে রাজা, কাঁদলে গোপাল।

আসল কাঁদবার মানুষ ছিল কামিনী—আগেই সে সরে পড়েছে।

সবাই বলাবলি করতে লাগলেন—বয়েস হয়েছিল ভদ্রলোকের। সারাজীবন ধরে নিজের অক্লান্ত অধ্যবসায়ের গুণে প্রচুর বিষয় সম্পত্তি করে গেছেন। এখন তাঁর মৃত্যুতে দুঃখ করার কিছু নেই।

দুঃখ যদি কারোও হয়ে থাকে তা হলো শুধু গোপালের।

মেয়ের ছেলে গোপাল। আইনতঃ মাতামহের সম্পত্তির এক কাণাকড়িরও অংশীদার সে নয়।

বিজনবাবু বেঁচে থাকতে যদিও বা তাকে কিছু তিনি দিতে চেয়েছিলেন, মিতালীই দিতে দেয়নি।

বলেছিল, সে নিজে দেবে।

শ্রাদ্ধ চুকে গেল খুব আড়ম্বরের সঙ্গে।

এত বড় একটা মানুষ মারা গেছে। শ্রাদ্ধের ঘটা মিতালীকে একটু করতে হলো বই-কি।

গঞ্জের বাড়ি ঘরদোর ছিল মিতালী দেবীর নামে। ছিল প্রচুর সোনা আর ছিল হাজার পঞ্চাশেক টাকা।

তাই থেকে শ্রাদ্ধের যাবতীয় খরচ সে চালিয়ে দিলে।

তার পরেই ঘটলো এমন একটা ঘটনা—যা কোনোদিন ঘটতে পারে বলে সে কল্পনা করতে পারেনি।

কোলকাতার একটি বড় ব্যাঙ্কে বিজনবাবুর নামে ছিল প্রায় লাখ তিনেক টাকা।

শ্রাদ্ধের পর নিশ্চিন্ত হয়ে মিতালী দেবী তাঁর উকিল শ্যামাপদ

বাবুকে বাড়িতে ডেকে এনে বললে—ব্যাঙ্কে একটা খবর দিয়ে দিন।

রাজার বাবা মারা গেলেন, এখন একাউন্টটা তারা যেন আমার নামে ট্রান্সফার করে নেয়।

আর আমার স্পেসিম্যান সহি নিয়ে যাবার জন্যে তারা যেন এখানে লোক পাঠিয়ে দেয়।

রাজা যেহেতু এখনও নাবালক, তার অভিভাবিকা হবার জন্যে আদালতে মিতালী দেবীর নাম খারিজ করতে হবে।

এমনি সব অনেক কাজ এখনও বাকি।

শ্যামাপদ উকিলকে তাড়াতাড়ি সেই সব ব্যবস্থা করবার জন্য মিতালী উপদেশ দিচ্ছিল, এমন দিনে তার নামে একখানা নোটিশ এলো।

নোটিশে ছিল মর্মান্তিক এক দুঃসংবাদ।

বিজনবাবু তাঁর মৃত্যুর কয়েক মাস আগে একখানি উইল রেজেষ্ট্রী করে গেছেন। শহরের সব চেয়ে বড় উকিল এবং বিজনবাবুর বন্ধু স্থানীয় আরও দুজন ভদ্রলোক সেই উইলের ট্রাষ্টি। তাঁরা জানাচ্ছেন শ্রীমতী মিতালী দেবীর যে টাকা এবং সম্পত্তি আছে সেইটুকু বাদে বিজনবাবুর স্বোপার্জিত যাবতীয় সম্পত্তি, ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকা ইত্যাদি সবই তিনি দিয়ে গেছেন গোপালকে। এই উইলখানি প্রোবেট নেওয়ায় কারও যদি কোনও আপত্তি থাকে তো তিনি যেন এক সপ্তাহ মধ্যে তা জানিয়ে দেন।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত এই সংবাদটি এসে পড়ল মিতালী দেবীর মাথায়।

দপ করে জ্বলে উঠলো মিতালী দেবী।

এ উইল মিথ্যা, এ উইল জাল।

শ্যামাপদ উকিলকে ডাকবার জন্য আবার লোক ছুটল। শ্যামাপদবাবু এলেন।

মিতালী বললে—দেখুন মজা।

নিজের ছেলেকে ত্যজ্যপুত্র করে মেয়ের ছেলে নাতিকে সব কিছু দিয়ে গেছেন উনি। আবার বলে কিনা উইলখানা রীতিমত রেজিষ্ট্রী হয়ে গেছে। আমি কিছু জানলাম না, শুনলাম না—এ কখনও হতে পারে না। এক্ষুণি জানিয়ে দিন এ উইল জাল।

শ্যামাপদবাবু বললেন—তাহলে আমাদের তরফ থেকে একটা নালিশ করতে হয়।

—নালিশ করতে হয় করুন।

দু'দিন পরেই পূজোর ছুটি।

শ্যামাপদবাবু বললেন—ছুটির পরে সেই ব্যবস্থাই করবো।

আপাততঃ উইলের প্রোবেটে আপত্তি জানিয়ে রাখি।

মিতালী বললে—হ্যাঁ, আপত্তি জানান। নালিশ করুন। আমার স্বামীর সম্পত্তিতে কেউ যেন হাত দিতে না পারে। তাঁর জন্যে ছেলের হাত ধরে আমাকে যদি পথে গিয়ে দাঁড়াতে হয়—আমি তাও রাজি।

উইলের কথা গোপাল সবই শুনেছে।

ইস্কুল-পাড়ার রায় সাহেব পঞ্চানন ঘোষাল তাকে ডেকে সব কথা বুঝিয়ে দিয়েছেন। বিজনবাবুর অকৃত্রিম বন্ধু এই পঞ্চাননবাবু।

কিন্তু উইলের ব্যাপারটা জানার পর থেকে কি যে হয়েছে গোপালের, লোকজন কাছে না থাকলেই তার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে।

মুখে হাত চাপা দিয়ে এক এক সময় ফুলে ফুলে উঠছে সে।

তার দিদিমা দেখে যেতে পারলেন না—এইটেই তার সব চেয়ে বড় দুঃখ।

আবার মাঝে মাঝে সে অবাক হয়ে যাচ্ছে শুধু এই কথা ভেবে এমন কি অপরাধ করেছে তাঁর স্ত্রী পুত্র, যার জন্যে তাদের একেবারে

বঞ্চিত করে বিজনবাবু তাঁর যথাসর্বস্ব দিয়ে গেলেন তাঁরই কন্যার সন্তান—সর্ব রিক্ত এই মাতৃহীন বালককে ?

গোপালের নিজেরই বড় লজ্জা করতে লাগলো।

রাজার কাছে, রাজার মার কাছে, সে যেন মুখ দেখাতে পারছে না।

মনে হচ্ছে যেন তারই অপরাধ।

আজকাল রাজাও তার সঙ্গে ভাল করে কথা বলে না।

তার মাও বলে না।

নীচের তলার ছোট একখানা ঘরে সে থাকে।

খায় দায় শোয়। মনে হয় সে যেন এ বাড়ির কেউ নয়।

পুজোর সময় সকলেরই ভাল ভাল জামা কাপড় এলো।

অথচ গোপালের কিছুই এলো না। সে জন্যে অবশ্য গোপালের মনে কোনও দুঃখ নেই।

পুরনো কাপড় জামা পরেই সে পুজোটা কাটিয়ে দিলে।

বিজয়া দশমীর দিন।

গুরুজনদের প্রণাম করছে সবাই।

গোপাল প্রথমেই তার দিদিমাকে প্রণাম করবার জন্যে ওপরে উঠে গেল।

মিতালী বসেছিল দোতলায়।

একাই বসেছিল।

একজন দাসী শুধু একটা চিরুনী নিয়ে তার পেছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ে দিচ্ছিল।

গোপাল অপরাধীর মত ধীরে ধীরে গিয়ে মিতালীর পায়ের কাছে বসে পড়লো।

তারপর মাথা হেঁট করে পায়ে হাত দিয়ে যেই সে প্রণাম করেছে, অমনি তার মাথার ওপর এক লাথি।

অকস্মাৎ অতর্কিত লাথিটা এত জোরে এসে লাগলো গোপালের মাথায় যে, একেবারে হকচকিয়ে গোপাল উলটে পড়ে গেল।

মিতালী বললে—বেরো হারামজাদা, আমার চোখের সুমুখ থেকে। লজ্জাও করে না। বিজয়ার প্রণাম করতে এসেছ।

গোপাল টাল সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

মিতালী তখনও তার গায়ের জ্বালা মেটাচ্ছে।

—দু'দিন পরে তোমাকেই হাত জোড় করে প্রণাম করবো আমি। আমি প্রণাম করবো, আমার ছেলে প্রণাম করবে। এখন যাও এখান থেকে।

গোপাল ধীরে ধীরে চলে গেল।

নীচে তার ঘরে গিয়ে সে কাঁদল কিছুক্ষণ।

আজ বিজয়া দশমীর দিনে এই তার প্রথম পুরস্কার।

রায় সাহেব পঞ্চানন ঘোষালের বাড়ি যেতে হবে তাঁকে প্রণাম করতে হবে। গোপাল বেরিয়ে গেল।

রাজা ছুটতে ছুটতে এলো তার মায়ের কাছে।

বললে—হ্যাঁ মা, বাবার বন্দুক-টন্দুক ছিল না?

মিতালী বললে—না বাবা, তোমার বাবা খুব ভীতু ছিলেন। বন্দুকের আওয়াজ হলে বলতো, আমার বুক ধড়ফড় করছে। তাই ওসব আমি ওকে কিনতে দিইনি।

রাজা বললে—বন্দুক একটা কিন্তু আমাদের থাকা খুবই দরকার। একটা কেনো না মা।

—দাঁড়া আগে মামলা মোকর্দমা চুকুক।

রাজা বললে—কিন্তু তার আগেই আমি ওকে শেষ করে দিতে চাই।

—কাকে শেষ করবি?

যে-ঝিটা তার মায়ের মাথার চুল আঁচড়ে দিচ্ছিল, তার দিকে তাকিয়ে রাজা বললে—তুমি একটু সরে যাও তো করুণা।

রাজা বললে—গোপালকে আমি মেরে ফেলবো। তুমি দেখে নিও মা।

—না রে না, ওসব কিছু কর'তে যাসনে। তার অনেক হাঙ্গামা।

এই বলে তিনি তাকে কোলের কাছে টেনে এনে তার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন—মামলায় সে হেরে যাবে বাবা, তুমি কিছু ভেবো না। যার ধন তার ধন নয়—নেপোয় মারে দই।

॥ উনিশ ॥

মামলা চললো অনেকদিন ধরে।

রায় সাহেব পঞ্চাননবাবু নিজের বাড়িতে এনে রাখলেন গোপালকে।

মিতালীকে বিশ্বাস নেই।

ছেলেটাকে হয়ত বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতে পারে।

মিতালীর তরফের উকিল প্রথমে বলেছিল—বিজনবাবুর সইটা জাল। সেটা যখন প্রমাণ করতে পারলে না তখন বললে—মিতালীর সতীন কামিনী দেবীকে খুশী করবার জন্যে অনেকদিন আগে মিছামিছি একটা উইলের খসড়া লিখে ফেলে রেখেছিলেন বিজনবাবু। উইলের ট্রাষ্টি তিনজন সম্পত্তির লোভে সেই খসড়া উইলটাকে আসল বলে বিজনবাবুর অজ্ঞাতে একটা নকল বিজনবাবু খাড়া করে উইলটা রেজিষ্ট্রী করিয়েছেন। বিজনবাবু তখন রীতিমত অসুস্থ। বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না তিনি।

একজন ডাক্তার পর্যন্ত সাক্ষী দিয়ে গেলেন।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না।

বিরুদ্ধপক্ষ প্রমাণ করে দিলেন—রীতিমত সুস্থ অবস্থায় বহাল তবিয়তে, স্বেচ্ছায়, অপরের বিনা প্ররোচনায় আনন্দ চিত্তে বিজনবাবু নিজে উপস্থিত থেকে উইলখানা রেজিষ্ট্রী করিয়েছেন।

মামলা চলল।

কিন্তু মিতালীর তাতে কোনও সুবিধেই হলো না।

ছোট আদালতের মামলায় মিতালী হেরে গেল।

তখন যেন সে রীতিমত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। হাইকোর্টে আপিল করল সে।

'কিন্তু নিচের আদালতের কাগজপত্র দেখে হাইকোর্টের জজও রায় দিলেন তার বিপক্ষে।

পর পর পরাজয়—

একদিকে পরাজয়ের গ্লানি, অন্যদিকে অযথা অর্থ ব্যয় আর লোকলজ্জা।

মোটর গাড়িখানা পর্যন্ত বিক্রি করে ফেরতে হয়েছে।

মিতালীর সব রাগ গিয়ে পড়ল তার পরলোকগত স্বামীর উপরে।

মিতালী আর বিজনবাবু দুজনে পাশাপাশি বসে একবার একটা ফটো তুলিয়েছিলেন তাঁরা। তার একটা বড় এন্‌লার্জমেণ্ট টাঙানো ছিল তার শোবার ঘরে।

চাকরকে ডেকে সে ছবিখানা সেখান থেকে নামিয়ে দিয়ে বললেন —এইটে গুদোমে রেখে দে বাবা।

চাকর অত সব বোঝে না। সে বললে—গুদোমে কেন মা? ভেঙে-টেঙে যাবে—তার চেয়ে খোকাবাবুর ঘরে আমি ওটা টাঙিয়ে দেব।

চীৎকার করে উঠল মিতালী।

বললে—যা বলছি তা করবি কিনা তাই শুনতে চাই।

চাকর নিশ্চুপ।

মিতালী আবার বললে—তোকে অত মোড়লি করতে হবে না হতভাগা—যা বল্‌লুম তা এখুনি করবি তুই। বুঝেছিস্?'

ছবিটা নিয়ে তক্ষুণি চাকর দৌড় দিল গুদোমের দিকে।

মিতালী নিজের মনেই কি যেন ভাবলে। একটা অসহ্য জ্বালা এসে তার সারাটা হৃদয়কে উত্তেজিত করে তুলল।

কিন্তু সবকিছু তার নাগালের বাইরে। বাধ্য হয়েই তাকে চুপ করে থাকতে হলো।

কিন্তু মনে মনে সে পরলোকগত স্বামীর উদ্দেশ্যে বোধ হয় অভিশাপ বর্ষণ করতে লাগল।

অনেকে মিতালীকে পরামর্শ দিলে সুপ্রীমকোর্টে আপীল করার জন্যে। কিন্তু তা করলে না মিতালী।

বললে—জানি ওখানে গেলে কোন কাজ হবে না—ফল হবে সেই একই। কোর্ট কাছারী আজকাল সব অন্ধ। কোনও সুবিচার হয় না ওখানে।

কিন্তু মনে মনে সব রাগ গিয়ে পড়ে সেই গোপালের ওপর।

রাজা ত তাকে পেলে খুন করে ফেলবে বলে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে বসে আছে।

মিতালী একদিন বললে—আচ্ছা, ছেলেটা যে পালিয়ে গেল এখান থেকে—ওকে একদিন ধরে আনতে পারিস্ আমার কাছে?

রাজা কিছু বললে না।

মিতালী আবার বললে—পারিস্ না?

রাজা বললে—না।

—কেন?

—তাকে একদিন বলেছিলাম ইস্কুলে। সে বলেছে যে সে আসবে না।

এম্‌নি যখন তাদের মনের অবস্থা, তখন হঠাৎ একদিন রাজা একটা মজার খবর নিয়ে এলো।

সে এসে বললে—মা, গোপালকে পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও।

—সে কিরে?

—হ্যাঁ।

—দূর। বড়লোক হয়েছে, তাই হয়ত কোথাও গেছে দুদিন স্ফুর্তি-টুর্তি করতে। দু চার দিন পরে ফিরে আসবে নিশ্চয়।

কিন্তু দুদিন কেন দুটি সপ্তাহ পার হয়ে গেল, তবু গোপালের কোনও পাত্তা পাওয়া গেল না।

রায় সাহেব পঞ্চাননবাবু পাগলের মত তাকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। হঠাৎ একদিন মিতালীর নামে একটা চিঠি এলো।

চিঠিখানা কোত্থেকে এলো তার কোনও ঠিকানা নেই। চিঠিখানা পড়লে মিতালী। লিখেছে গোপাল—

লিখেছে—আপনি আমার প্রণাম জানবেন। দাদামশাই তাঁর উইলে আমাকে যা কিছু দিয়ে গেছেন সবই আমি আপনাকে ফিরিয়ে দিলাম। আমি গরীবের ছেলে গরীব হয়েই থাকতে চাই! আমি আর কোনদিন আপনাদের কাছে গিয়ে দাঁড়াব না—সম্পত্তিও চাইব না।

আপনারা নিশ্চিন্ত হোন্, সুখী হোন্, এই আমি চাই। ইতি—

গোপাল।

চিঠিটা পড়ে বিস্ময়ে যেন স্তব্ধ হয়ে যায় মিতালী। এও কি সম্ভব?

এত সহজে ছেলেটা এই অতুল ঐশ্বর্য ত্যাগ করবে কিভাবে? মামলাতে জিতেও সে কেন এমনিভাবে সব কিছু ত্যাগ করতে চায়?

মিতালী ঠিক বিশ্বাস করেনি প্রথমটা। তাই সে নিশ্চিন্তও হতে পারেনি। নিশ্চিন্ত হলো সেইদিন, যেদিন রায় সাহেব পঞ্চাননবাবু খুঁজে বের করলেন গোপালকে।

গোপাল তখন রামকৃষ্ণ মিশনের অনাথ আশ্রমে থাকে। অনাথ আশ্রমের বিদ্যালয়ে পড়ে।

তাকে ফিরিয়ে আনার জন্যে চেষ্টা করলেন রায়সাহেব।

কিন্তু পারেননি ফিরিয়ে আনতে।

রায় সাহেব বলেছিলেন—তুমি শেষে মিশনে এসে আশ্রয় নিলে?

গোপাল বললে—আজ্ঞে না মিশনে নয়।

—তবে?

—ভগবান রামকৃষ্ণের কাছে আমি আশ্রয় নিয়েছি।

—তা ত অবশ্য ঠিক, তবে....

—না। এ আশ্রয় আমি ত্যাগ করব না। এ আশ্রয় আপনাদের আশ্রয়ের চেয়ে অনেক বেশি নিরাপদ।

রায়সাহেব ফিরে এলেন।

তিনি বুঝলেন এর ওপর কোন কথা বলেও লাভ নাই।

তাই তিনি একটু পরে বললেন—বাড়িতে বসে কি রামকৃষ্ণের আশ্রয় নেওয়া যায় না?

—যায়—যদি না বিষয় সম্পত্তির আবর্ত্ত তার মধ্যে না থাকে।

—তবে তুমি চল—সম্পত্তি নিতে হবে না।

—যে শান্তি এখানে পেয়েছি, তা ত্যাগ করতে আমি পারব না—এ অনুরোধ আমায় আপনি করবেন না।

অগত্যা চুপ করলেন তিনি।

এ সব কথা যথা সময়ে শুনতে পেল মিতালী। সব শুনে সে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল।

ভাবতে লাগল, ছেলেটা যেন শুধু নিজেকে সামলাতেই তাকে হারায়নি—বাস্তব জীবনেও সে তাকে অনেকখানি হারিয়ে দিয়েছে।

সেই হেরে যাওয়ার ব্যথাটা যে এত তীব্র অনুশোচনা এনে দেবে এর আগে তা সে ভেবেনি কোনদিন।

সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য একটা চিন্তা তার মাথার মধ্যে খেলা করতে লাগল। সে চিন্তা হলো, সেও এই সম্পদ নিয়ে কি করবে?

ছেলের জন্যে যে সামান্যটুকু দরকার। তা বাদ দিয়ে বাকি সব যদি সে রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করে দেয় ত কেমন হয়?

সেটাই ত প্রকৃত কল্যাণময়ী নারীর ধর্ম।

হ্যাঁ, সে তাই করবে। তার মৃত্যুর পর যা থাকবে রাজার চলার মত তাকে দিয়ে বাকি সব সে দান করবে দেশের সেবায়।

দেশ আর জাতি গঠনের কর্তব্য সামান্য একটা মানুষের ভোগ বিলাসের চেয়ে অনেক বড়।

শেষ